মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
কিশোর উপন্যাস

বুকের ভিতর আগুন

জাহানারা ইমাম

BANGLAPDF
EXCLUSIVE

আরো বেশ কয়েক মিনিট গুলি চালিয়ে গেল ওরা। ওপক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। মোহন বলল, 'টর্চ আর বেয়নেট নিয়ে ঘরে ঘরে ঢোক। জখমী যে কয়টা বেঁচে আছে, খুঁচিয়ে শেষ করে দাও।' সে নিজেও টর্চ হাতে একটা ঘরে ঢুকল। আর তখনই ঘটল সেই মহা সর্বনাশ। মোহন ঘরের ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই কোণা থেকে একটা গুলি ছুটে এসে বিদ্ধ করল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আঁ-ক্ করে কেমন একটা শব্দ বেরোল মোহনের মুখ থেকে। ঠিক চিৎকারও নয়। কিন্তু সে ধপাস করে পড়ে গেল। তার পেছনেই ছিল শান্টু। সে সঙ্গে সঙ্গে তার রাইফেল তাক করে মেরে ফেলল মেঝেয় পড়ে থাকা আহত পাকসেনাটিকে। তার পরেই সে হাহাকার করে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'নান্টু, নান্টু, একি সর্বনাশ হল।'

তার চিৎকারে সবাই ছুটে এল। শান্টু ততক্ষণে মেঝেতে বসে পড়ে মোহনের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে। সবাই হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে চারপাশে ঘিরে ঝুঁকে পড়ল। মোহনের বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছে, অজস্র ধারে রক্ত পড়ছে, তার রক্তে শান্টুরও জামা ভিজে গেছে।

জীবনীশক্তি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এর মধ্যেই চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে সবার মুখের দিকে তাকাল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'ফিরে এসে কবর দেবে। এক্ষুণি পীরগঞ্জের পথে রওনা হয়ে যাও। ডবল মার্চ। কমান্ডারের আদেশ।'

তারপরেই তার মাথাটা একপাশে ঢলে পড়ল।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ■ শিশির ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস

বুকের ভিতর আগুন

মোঃ ফজলে রাব্বি (রুশো)

ঃ ব্যক্তিগত সংগ্রহঃ

২২/১১/২০১৭ইং

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস

বুকের ভিতর আগুন

জাহানারা ইমাম

Rudro

চারুলিপি

© সাইফ ইমাম জামী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৩/ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৭/ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হুমায়ূন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত
এবং পাণিনি প্রিন্টার্স ১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শিশির ভট্টাচার্য

দাম : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 194 1

BUKER BHITOR AGUN by Jahanara Imam
First Print : February 1990. 2nd Print : February 2017
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100
E-mail : charulipi_prokashon@yahoo.com
Phone : +88 02 9550707 Cell : 01715 98 38 99
Price : 125.00 Only. $ 3.00

International Distributors

Sangeeta Limited, 22 Brick Lane, London
Muktadhara, 37-69, 2nd floor, 74 St. Jackson Heights N.Y. 11372
ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto

অনলাইনে বই কিনতে

http://rokomari.com/charulipi ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭,
পড়ুয়া www.porua.com.bd :: bkash এ বই কিনতে পেমেন্ট করুন : ০১৭১৫৯৮৩৮৯৯

পরিদর্শন করুন

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর
কণিকা, ৩৫৫ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরণী, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

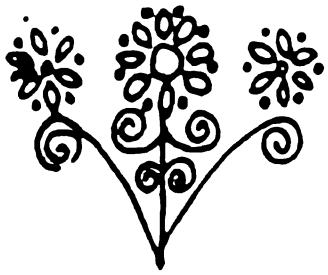

উৎসর্গ

তওহিদা ও হাবিবুল আলম কে

উপক্রম

রাত্রে ঘুমের মধ্যে একবার যেন মনে হয়েছিল কি সব কথাবার্তা চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে; কিন্তু শান্টুর ঘুম যা গাঢ়। ওই মনে হওয়াটাই মাত্র। চেতনার কিনারায় একবার ভুস্ করে মাথা তুলেই আবার সে তলিয়ে গিয়েছিল ঘুমের গহীনে। শান্টুর মা বলেন, ঘরে গরুমোষ জবাই করে ফেললেও শান্টু টের পাবে না। শান্টুর এতে ভয়ানক আপত্তি। একটা গরু বা মোষকে পাঁচসাতজন লোক মাটিতে পেড়ে ফেলার সময় যেরকম ধুন্ধুমার শব্দ ওঠে, তাতেও ঘুম ভাঙবে না, এমন বিচ্ছিরি রকমের ঘুম শান্টুর নয়। কিন্তু কে শোনে তার আপত্তি। মা কথাটা বলামাত্র আর সবাই তাতে এমন মজা পেয়ে যায় আর এতবার করে সবাই সেটার পুনরুক্তি করে যে, কথাটা এখন বাড়িতে প্রবাদ কথার মতো হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাত্রে কখনই ওরকম গরুমোষ জবাই করার মতো হৈ-হল্লা হয়নি, কারণ শান্টুর ঘুম যখন পাতলা হয়ে এসেছিল, সে কারো কোন উচ্চকণ্ঠ, হাঁকডাক শোনেনি, দরজার শিকল ধরে ঝনঝন করার শব্দের সঙ্গে ফিসফিস কণ্ঠে কথা, লণ্ঠনের ফিতে উস্কে দরজা খুলে উঠোনে নামা, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করা, কাউকে ফিসফিস করে কিছু বলা, তারপর লণ্ঠনের বাতি কমে যাওয়া, এর বেশি কিছু হয়নি। তাই তার ঘুমটাও পুরোপুরি ভাঙবার অবকাশ পায়নি। এখন সকালে চোখ মেলতেই সব মনে পড়ে গেল এবং সে বিদ্যুৎবেগে বিছানার ওপর উঠে বসে ঘরের চারদিকে তাকাল।

বিরাট লম্বা টিনের ঘরটার ওইপাশে বাবা-মার বিরাট পালং। ওখানে শোয় তার দুই বোন, ছোট ভাই আর মা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, তার দু'পাশে বেঞ্চি। ঘরের একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দুটো চৌকি। টেবিলের দিকের চৌকিতে বাবা শোয়, দেয়ালের দিকেরটায় সে। এই দেয়ালে একটা দরজা, সেটা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। সে ঘরে দুটো চৌকিতে শোয় তার বড় দুই ভাই। পালংকের দিকে তাকিয়ে দেখল, মশারির মধ্যে ছোট ভাইটা এখনো ঘুমিয়ে আছে। বোন দুটো, মা, সবাই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে। বাবাও ঘরে নেই। সে উঠে মশারির একটা দিক তুলে বিছানার বাইরে এল। বড় ভাইয়ের ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি দিল। তখনই বুঝল মাঝরাত্রে কোন অতিথি এসেছে। তার শিকল নাড়ার শব্দে বাবা ঘুম ভেঙে লণ্ঠন উস্কে দরজা খুলেছিলেন, আবার ভেতরে এসেছিলেন। ঐ অতিথি এখন মেজভাইয়ের চৌকিতে শুয়ে আছে। মেজভাই বড়ভাইয়ের সঙ্গে তার চৌকিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে এখনো ঘুমন্ত।

শান্টু সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। উঠোনের শেষ প্রান্তে রান্নাঘর, রান্নাঘরের বাঁ পাশে একটা স্থলপদ্মের গাছ। সেই গাছের পাশ দিয়ে পেছন বাড়িতে যাবার রাস্তা। অন্যপাশে রান্না করার চেলাকাঠ রাখার জন্য একটা চালাঘর। সেই ঘরের সামনে তার বড় বোন সাহেরা হাঁসমুরগিকে খাবার দিচ্ছে। আর ওগুলো কঁক্‌কঁক্, কোয়াক্ কোয়াক্ শব্দ করতে করতে ক্ষুদকুঁড়োর সানকি দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সে দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে, চওড়া বারান্দা পেরিয়ে তিনটে সিঁড়ির ধাপ মাড়িয়ে উঠোনে নেমে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। মা চুলোর ওপর বসানো কড়াইতে কিছু একটা নাড়ছেন। দেখে সুজি মনে হচ্ছে। মেজবোন তাহেরা চুলোর কাছাকাছি মেঝেতে বসে পরোটা বেলছে। তার মানে নির্ঘাত কোন বিশেষ মেহমান। নইলে রোজকার বরাদ্দ মুড়ি গুড় বা আটার রুটি-আলুভাজি বাদ দিয়ে পরোটা হালুয়া হয়! এর মধ্যে সাহেরা দুটো ডিম হাতে ঘরে ঢুকল। 'আজ এই দুটোই পেলাম মা' অর্থাৎ মুরগির ঘর থেকে

সদ্য পাড়া দুটো ডিম কুড়িয়ে আনল সে। মা বললেন 'রাখ, ওতেই হবে। চট করে দুটো পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ কুচিয়ে দে'। শান্টু মার পাশে মেঝেতে উবু হয়ে বসে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে মা?'

মা এতক্ষণ খুন্তি দিয়ে সুজি ভাজছিলেন। এবার একটা ঝকঝকে কাঁসার ঘটি থেকে ভাজা সুজির ওপর পানি ঢালতেই ছাঁ-আঁ-আঁ ... করে শব্দ উঠতে থাকল খানিকক্ষণ। এক হাতে পানি ঢালার সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে খুন্তি দিয়ে সাবধানে দ্রুত নাড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে মা তক্ষুণি শান্টুর কথায় জবাব দিতে পারলেন না। তবে প্রশ্নটা মনে ছিল। সুজি নেড়ে চেড়ে যখন সুন্দর মোহন ভোগ তৈরি হয়ে গেল, তখন তিনি ছেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তোর বড়খালার ছেলে—' মার মুখ থমথমে, দেখে মনে হয় ভোরবেলা কেঁদেছেন। সাহেরা তাহেরা কেমন শুকনো মুখে কাজ করে যাচ্ছে। খালাতো ভাই বাড়ি এলে যেরকম খুশি খুশি ভাব হওয়া উচিত, সে রকমটি দেখা যাচ্ছে না। তবে এই খালাতো ভাইটি তাদের তেমন পরিচিত নয়। তারা অনেক দূরে সে-ই রাজশাহীতে থাকে। বোনদের নিরুৎসাহের কারণ হতে পারে, কিন্তু মায়ের মুখ কান্নাফোলা হবে কেন? মা একটা বড় রেকাবিতে মোহন ভোগ ঢেলে ঘি-মাখানো আঙুল দিয়ে চেপে-চুপে সমান করে তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "তোর খালাখালু দুজনকেই মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। তাদের ছেলেমেয়েদেরও গুলি করে শেষ করে দিয়েছে। কেবল এই ছোট ছেলেটা কি করে যেন ভাঁড়ার ঘরের চৌকির নিচে সেন্দিয়ে ছিল, তাই বেঁচে গেছে।"

'ব-ল-কি!' শান্টু দুই চোখ বড় বড় করে মাটির মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ে। তার মুখটাও কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। বড়খালার বাড়ি তাদের খুব একটা যাওয়া হয় না বটে, তবে বড়খালা দু'তিনবছর পরে একবার করে আসতেন। তাঁর তিন ছেলে এক মেয়ে। সবচেয়ে ছোটটি শান্টুর সমবয়সী। ছেলেটির সঙ্গে তার মোটেও বনতো না। ওইটুকু বয়সেই তার ভয়ানক নাক উঁচু ছিল। অন্তত শান্টুর তাই মনে হত। খালার অন্য ছেলেমেয়েরা

কিন্তু তাকে খুব আদর করত। সেই চমৎকার ছেলেমেয়েগুলো মিলিটারীর গুলিতে মরে গেছে? আর বেঁচে আছে ঐ অহংকারী ছেলেটা?

হঠাৎ মনে মনে জিভ্ কাটল শান্টু। একি যা তা কথা ভাবছে সে! আহা! বাবা-মা, ভাই-বোন সব হারিয়েছে সে, তার সম্বন্ধে এরকম নির্দয় চিন্তা করা শান্টুর মোটেই উচিত হচ্ছে না। শান্টুর বাবা-মা, ভাই-বোন সবই আছে, তার এখন উচিত ঐ সর্বহারা এতিম ছেলেটিকে ভালোবাসা, তার মানে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করা। মা চোখ মুছে বললেন, 'ওকে ডাকিস না। যতক্ষণ পারে, ঘুমোক। তোরা হাতমুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে নে।'

শান্টু বলল, 'ও আমাদের গ্রাম চিনে এলো কি করে? সেই রাজশাহী থেকে কম দূর তো নয়।'

মা বললেন, 'ও প্রথমে ঢাকা চলে গিয়েছিল ওর চাচার কাছে। ঢাকারও অবস্থা ভালো নয়। ওর চাচাতো ভাইরা জানে বাঁচবার জন্য গ্রামে লুকিয়ে ছিল। ও বয়সে ছোট, ওদের সঙ্গে রাখার অসুবিধে ছিল, তাই ওর কাছে আমাদের ঠিকানা জেনে ওকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে কাল মাঝরাতে।'

শুনে শান্টু খানিকক্ষণ থম ধরে বসে থাকে। ছেলেটার চাচাতো ভাইদের খুব সাহস আছে বলতে হবে। নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওকে মাঝরাতে হলেও ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছে বটে। সে উঠে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। স্থলপদ্ম গাছটার পাশ দিয়ে পেছন বাড়িতে চলে গেল। এখানে আছে তাদের গোটাকতক ধানের গোলা, ধান শুকোবার জন্য একটা মাঝারি সাইজের পাকা উঠোন, মেয়েদের গোসল করার জন্য একটা পাকাঘর। তারপাশে টিপ-কল। তার চারপাশটা বাঁধানো। কাপড়-কাচা এবং পুরুষদের গোসল করার জন্য। একেবারে শেষ প্রান্তে পাকা পায়খানা। তার পাশেই সীমানা-বেড়ার গায়ে একটা টিনের দরজা। এটা দিয়ে বাইরে গেলেই দেখা যায় বেশ বড়সড় একটা পুকুর। পুকুরটা ওদেরই। তবে পাড়ার সবাই ব্যবহার করে।

শান্টু আজকে আর কল-তলায় গেল না মুখ ধুতে। নিমের দাঁতনে দাঁত ঘষতে ঘষতে পুকুরপাড়ে চলে গেল। পুকুরের চার

পাড় ঘিরে প্রচুর গাছগাছালি। শান্টুদের দিকের ঘাট সান বাঁধানো। ধাপে ধাপে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে পুকুরের পানির ভেতর। বর্ষায় পুকুর যখন ভরে ওঠে, তখন মাত্র দুটো কি তিনটে সিঁড়ি দেখা যায়। শীতের শেষে পুকুরের পানি কমতে কমতে বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি বেরিয়ে পড়ে। পুকুরের অন্য তিনদিকেও ঘাট আছে, তবে সেগুলো গাছের কাটা গুঁড়ি দিয়ে বানানো। পাড়ার অন্যসব বাড়ির লোকেরা ব্যবহার করে ঐ ঘাটগুলো।

শান্টু ঘাটের সিঁড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন ঘষল। আকাশটা মেঘলা হয়ে রয়েছে। কেমন যেন ভিজে ভিজে একটা বাতাস দিচ্ছে, পুকুরের পানিতে ঝিরঝির করে তরঙ্গ উঠছে। শান্টু একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই ঝির ঝির করে বয়ে যাওয়া পানির দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথাটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে। মনে হয়, সে যেন একটু একটু করে পানির ঐ সরু সরু চুড়ির মতো তরঙ্গমালার ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। তার ছোট ভাই রান্টু তাকে ডাকতে ডাকতে আসছে। সে তাড়াতাড়ি দু-তিনটে সিঁড়ি নেমে হাতের তালুতে পানি নিয়ে কুলি করতে লাগল। রান্টু ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাগতস্বরে বলল, 'ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেল, ধ্যানে বসেছিলে নাকি?'

শান্টু হুস হুস করে কয়েক আঁজলা পানি চোখে মুখে কপালে ছিটিয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল, 'কথা বলার ছিরি কি! এত ডাকাডাকির কী হয়েছে? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?'

'ডাকাত না পড়লে বুঝি ডাকাডাকি করা চলে না? ওদিকে সবার নাশতা খাওয়া হয়ে গেল, শুধু তুমিই উধাও। মা কতক্ষণ নাশতা আগলে বসে থাকবে? বাড়িতে আর কাজ নেই?'

শান্টু জানে মা মোটেই নাশতা আগলে বসে নেই। শান্টুর খালিপেটে পিত্তি পড়বে এই ভয়েই মায়ের ডাকাডাকি। তিনি তার নাশতা সরপোষ ঢাকা দিয়ে রেখে সংসারের কাজে লেগে গেছেন। তবু সে খেঁকিয়ে উঠল, 'নাশতা টেবিলে ঢেকে রাখলেই তো হয়।

তার জন্য কাজ বাকি থাকবে কেন? তোরে ডাকতে বলা হয়েছে ডেকে চলে যা। এত কথা বলার দরকার কি?'

আসলে রান্টু তখনই রাইট-এ্যাবাউট-টার্ন করে বাড়ির দিকে চলে গেছে, শান্টুর খেঁকানি শোনার জন্য দাঁড়িয়ে নেই। শান্টুর তাতে রাগ আরো বেড়ে গেল। বকুনিটা রান্টু শুনলই না! খুব আস্পর্ধা বেড়েছে ছেলেটার। শান্টুকে একদম মানতে চায় না। আগে তো শান্টু বলেই ডাকত। মা অনেক বকেঝকে এখন সেজভাই ডাকটা রপ্ত করিয়েছেন। তাও মেজাজ চটে গেলে সে শান্টু বলে ফেলে।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে শান্টু টের পেল, পেটের মধ্যে ক্ষিদেটাও বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সে দুদ্দাড় বড় ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে দরজার দিকের লম্বা বেঞ্চিটায় বসে পড়ল। ওই পাশের বেঞ্চে তখনো বাবা, বড় ভাই আর ঐ ছেলেটা বসে আছে। এপাশ থেকে মা, বোনেরা উঠে গিয়ে কোথায় যেন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। শান্টুর নাশতা টেবিলের ওপর সরপোশ দিয়ে ঢাকা। শান্টু এসে বসতেই বাবা নীরব তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। শান্টু একনজর তাঁর দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করে ফেলল। তার মুখে ফুটে উঠল নীরব মিনতি। বাবা যেন তাকে এখন ঐ ছেলেটার সামনে না বকেন। বাবা সত্যিই মুখে কিছু বললেন না, সেও যে ঐ মেহমান ছেলেটার জন্যই, তাও শান্টু বুঝল। খেতে খেতে সে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল। ছেলেটি শান্টুর মাথার ওপর দিয়ে খোলা দরজার দিকে কেমন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঘরের কারো দিকে তার খেয়াল নেই। কয়েক বছর আগে দেখা সেই গোলগাল নধর ছেলেটার সঙ্গে এই ছেলেটার কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছে না শান্টু। রংটা শ্যামলাই ছিল, এখন রোদে পুড়ে কালো দেখাচ্ছে। দুই গাল বসে গেছে, চোখের নিচে কালি। ফুলহাতা বুশসার্টের জন্য বোঝা যাচ্ছে না গায়ে-গতরে কতখানি রোগা হয়েছে। এই ক'বছরে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের আভাস। শান্টু অবাক হল। তারইতো বয়সি ছেলেটা, শান্টুর গোঁফ-দাড়ির নামনিশানা নেই, আর ওর দুই গালে কালচে আভা! ও এর মধ্যেই শেভ করা

ধরেছে নাকি? ওর নামটা যেন কি ছিল? শান্টু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তারই আপন খালাতো ভাই অথচ তেমন যোগাযোগ ছিল না। তার বাবা এই গ্রামের বড় জোতদার, গঞ্জেও তাঁর ধানচালের আড়ত আছে। বিষয়-আশয় নিয়ে তিনি সারা বছরই এমন ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন যে কয়েকদিনের জন্য সে সব ছেড়ে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবার মতো সময় বের করে উঠতে পারেননি কখনোই। আসলে তিনি একটু ঘরকুনোও বটে। বড় খালু রেলের কি যেন চাকরি করতেন, পাস পেতেন, তাই পুরো পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসতে পারতেন। তাও অবশ্য তিন চার কি পাঁচ বছর পর একবার। শেষ এসেছিলেন ছয়সাত বছর আগে। তারপরেই খালু বদলি হয়ে গেলেন রাজশাহীতে। সুদূর উত্তরবঙ্গে যাবার পর আর তাঁদের এদিক পানে বেড়াতে আসা হয়নি। বড় খালা যখনই আসতেন, তাদের সবার জন্য জামাকাপড়, খেলনা কত কি আনতেন। অমন চমৎকার মমতাময়ী মানুষটি আর বেঁচে নেই? নিষ্ঠুর খানসেনার হাতে গুলি খেয়ে মারা গেছেন! যে খালাতো ভাই-বোনগুলি তাকে এত আদর করত, তারাও আর বেঁচে নেই। অকালে বুলেটের ঘায়ে ঝরে পড়েছে। শান্টুর মনের মধ্যে খুব কষ্ট হতে লাগল। চোখ ভিজে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টায় চোখের পানি ঠেকিয়ে সে খাওয়া শেষ করল। বারান্দায় বেরিয়ে বদনা থেকে পানি ঢেলে হাত ধুল, কুল্লি করল। তারপর লুঙ্গির তলার দিকে ভিজে হাত মুছে আবার ঘরে এল। বাবা বললেন, 'শান্টু, মোহনকে নিয়ে একটু পুকুর পাড়ে বেড়িয়ে আয়।"

ছেলেটার নাম তা হলে মোহন। কি সুন্দর নাম! তার কি বিচ্ছিরি একটা নাম! শা-ন্টু! নামটা একদম পছন্দ নয় তার। যদিও এটা তার ডাকনাম, তবু ডাকনামই তো সদা-সর্বদা সবার কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে। ভালো নামটা যত ভালো হোক, সেটা তো কখনোই উচ্চারিত হয় না। শান্টু ঠিক করল মোহনকে সে তার ভালো নামটা আগে বলবে। সে মোহনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এসো ভাই—' মোহন উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার হাতটা ধরল না। ধীর গতিতে ঘরের দরজার দিকে পা ফেলল। শান্টুর মনটা

সঙ্গে সঙ্গে চুপ্‌সে গেল। মোহন তার প্রসারিত হাত ধরল না! কিন্তু সে ভাবটা সে মুখে ফুটতে দিল না। যেন সে আদপেই হাত বাড়ায়নি, এমনি ভাব করে হাতটা পাশে ঝুলিয়ে মোহনের সঙ্গে সঙ্গে পা পেলে পেছন-বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। মোহন চারদিকটা তাকিয়ে দেখছিল। শান্টু খুব আলগোছে বলল, 'আমার নাম মাহবুব। তোমার?'

'মোহন।'

'না, না, ডাকনাম নয়, ভালো নাম।'

ভালো নাম? মোহন এমনভাবে শান্টুর দিকে তাকাল, যেন কথাটার মানে সে জানে না।

শান্টু একটু বিব্রত বোধ করল, 'ভালো নাম—মানে যে নামটা স্কুলের খাতায় লেখা হয়—মানে ঐ যাকে বলে পোশাকী নাম—'

'ও—মাহবুব।'

'মাহবুব!' শান্টু যেন হঠাৎ বোকা হয়ে যায়। অবাক দৃষ্টিতে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে থেকেই সামলে নেয়, 'ধুস্! ও তো আমার নাম।'

মোহন ভ্রুকুটি করে বলল, 'ওটাই আমার নাম। মাহবুবে রব্বানী। তোমার নামের শেষ অংশ কি?'

শান্টুর বেজায় খারাপ লাগতে লাগল, সে ব্যাজার মুখে বলল, 'আলী।'

'তোমার ডাক নাম কি?' এবার শান্টুর মেজাজ বিগড়ে গেল, সে বলতে চাইল তার কোন ডাকনাম নেই। হঠাৎ মনে হল মিথ্যে বলে লাভ কি? বাবা, মা, ভাই-বোনেরা কেউ একবার ডাকলেই তো সব গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। সে গোমড়া মুখ করে বলল, 'শান্টু।'

'বাঃ, ভারি চমৎকার নাম তো।'

'চমৎ-কার!' শান্টুর মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বলে দুই চোখে দেখতে পারে না তার এই নামটা, আর মোহন বলে কিনা চমৎকার?

'হ্যাঁ, বেশ একটা টগবগে ভাব আছে নামটায়। আমার ডাকনামটা খুব বাজে লাগে, কেমন যেন মিইয়ে পড়া, মিনমিনে। ভাবছি নামটা বদলে তোমার নামের সঙ্গে মিল করে রাখব। ভালো নামও যখন এক—'

শান্টু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মোহনকে তার খুব ভালো লেগে যায়। সে মুচকি হেসে বলে, 'মেলাও দেখি।'

মোহনের কালচে মুখেও যেন একটুখানি হাসির আভা ফুটে ওঠে—'তুমিই বল না কি রাখা যায়।'

শান্টু বেশ মুরুব্বিয়ানা সুরে বলল, 'আমার বড় দুই ভায়ের ডাকনাম মন্টু আর ঝন্টু। ছোটটার নাম রান্টু তা হলে আর থাকল কি?' বলে হি হি করে হেসে উঠল সে, 'আমরা চার ভাই-ই সব নিয়ে নিয়েছি।'

মোহন বেশ মজা পেয়ে গেল, যেন ধাঁধাঁর জবাব দিচ্ছে, এমনিভাবে বলল, 'পান্টু, নান্টু, লান্টু—'

শান্টু হেসে কুটিপাটি হল, 'দূর! পান্টু, লান্টু জন্মেও শুনিনি। নান্টু হতে পারে বটে'—

'হ্যাঁ, নান্টু শোনাচ্ছে ভালো। বেশ, তা হলে নান্টুই হল আমার নাম। আমি তোমার আরেকটা ভাই।'

শান্টুর বুক দুলে ওঠে মমতায়, সহমর্মিতায়। তার ইচ্ছে হয় মোহনের হাত দুটো ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। কিন্তু সাহস হয় না। কি জানি, মোহন যদি আবারো হাত না বাড়ায়!

কথা বলতে বলতে ওরা পুকুরঘাটে চলে এসেছে। পুকুর দেখে মোহন খুশি হয়ে উঠল। শান্টু একবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, রাজশাহীতে পুকুর ছিল কিনা; কিন্তু কপাল ভালো, বাক্যের প্রথম শব্দটি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরোবার আগেই সেটাকে চেপে ফেলতে পারল। সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল আরকি। মোহন কেবল একটুখানি সহজ হয়ে উঠেছে, এই সময় রাজশাহীর কথা তুললে তার মন নির্ঘাত খারাপ হয়ে যেত। মোহন ছোট বাচ্চার মতো পায়ে শব্দ তুলে দু-তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে একবারে পানির কিনারায় গিয়ে বসল। বলল, 'পুকুর দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। রাজশাহীতে আমাদের বাড়ির পেছনে একটা পুকুর ছিল—'

এইরে সেরেছে! মোহন নিজেই রাজশাহীর কথা তুলেছে। কিন্তু শান্টু অবাক হয়ে দেখল, মোহনের মুখভাবের কোন পরিবর্তন হল না। সে বেশ সহজ গলাতেই বলল, "আমাদের পুকুরটায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম। তোমাদের ছিপ আছে নিশ্চয়ই?"

শান্টু হেসে উড়িয়ে দিল, 'দুর! ছিপ দিয়ে মাছ ধরে সুখ আছে? না, সময় আছে কারো?' তার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু গর্বের ভাব ফুটল, 'আমরা মাছ ধরি জাল ফেলে। তুমি জাল ফেলতে পারো? আমি কেবল শিখেছি।'

মোহন মৃদু হেসে বলল, 'আর কি কি শিখেছ তুমি?'

মোহনের কণ্ঠস্বরে কি একরকম রহস্য আর কৌতুক মেশানো। শান্টু হক্‌চকিয়ে বলল, 'আর কি কি মানে?'

'এই মানে—' মোহন হঠাৎ চেপে গেল, 'নাহ্, ঠাট্টা করছিলাম।' তারপর প্রশ্নটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এদিকে মিলিটারী আসেনি?'

'না, কপাল ভালো, আমাদের গ্রামটাতেই শুধু ঢোকেনি। আমাদের পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল মে মাসে। তখন ঐ গ্রামের অনেক লোক পালিয়ে আমাদের গ্রামে এসেছিল। আমাদের বাড়িতেই তো ছিল প্রায় পনের কুড়ি জন।'

'চিন্তা নেই, তোমাদের গ্রামে আসার সময় ফুরিয়ে যায়নি।'

'তার মানে?' শান্টু ভয়ানক রকম চমকে ওঠে। মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়, মোহন ওর সমবয়সী নয়, ওর চেয়ে বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় অনেক বড়। সে ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল, 'কি যে অলক্ষুণে আবোল-তাবোল কথা কও!'

'অলক্ষুণে নয়, আবোল তাবোলও নয়, এইটেই খাঁটি সত্য কথা। ঐ জানোয়ারগুলো এদেশের সব গ্রামই একে একে জ্বালিয়ে দেবে, দু'দিন আগে বা দু'দিন পরে। জানো না, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কি বলেছে? ওরা এই পূর্ব বাংলার মানুষ চায় না, চায় এদেশের মাটি। তাই তো সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, মানুষ মেরে সাফ করছে। ওদের যদি এখন থেকেই বাধা দেওয়া না যায় তা হলে কেউই বাঁচবে না, কিছুই বাঁচবে না।'

শান্টু স্তব্ধ হয়ে মোহনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি বলে ছেলেটা! মোহন হঠাৎ সোজাসুজি শান্টুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের খবর রাখ?'

শান্টু ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল, সর্বনাশ! মোহন যে একেবারে ভীমরুলের চাকের দিকে থাবা বাড়িয়েছে! বাবা-মা

পইপই করে নিষেধ করে দিয়েছে, জান গেলেও কাউকে একটি কথা যেন না বলে এ বিষয়ে। আবার মোহনের সামনে 'জানি না' বলতেও পৌরুষে বাধছে। মোহন তা হলে কী ভাববে তার সম্বন্ধে? তাকে ইতস্তত করতে দেখে মোহন বলল, 'হয় তুমি একটা হাবাগঙ্গারাম, নাহয় স্রেফ চেপে যাচ্ছ। তোমার বড় দুভাই যে মুক্তিযোদ্ধা, তা জান তুমি?

শান্টু ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, 'না, না, কে বলল, মোটেই না। ওরা তো ধানচালের ব্যবসা করে। গঞ্জে বাবার আড়ত আছে। ওরা রোজ সকালে নাশতা খেয়ে সেইখানে যায়—'

তার মুখের কথা কেড়ে মোহন বলল, 'আর রাত দুপুরে লক্ষ্মী ছেলের মতো বাড়ি ফিরে চৌকিতে শুয়ে ঘুমোয়।' সে খুক খুক করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই আবার বলল, 'সবাইকে যে মেশিনগান হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হবে, তার কি মানে? আড়তে বসেও যুদ্ধ করা যায়। ওই ধানচালের আড়তই তো একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নিরীহ মুখ করে আড়তে বসে ধান-চাল বেচে, শয়ে শয়ে খদ্দের এসে সওদা করে যায়, তার মধ্যে কে গেরস্ত, কে মুক্তিযোদ্ধা তা কি মুখে লেখা থাকে? তুমি বলতে চাও তুমি কিচ্ছুটি জান না?' শান্টুকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয় মোহন সত্যিসত্যিই তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি পরিপক্ব। সে ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধা-সম্পন্ন ছিল, পরীক্ষায় সব সময় প্রথম হ'ত, বৃত্তিপরীক্ষায় খুব ভালো ফল করে বৃত্তি পেয়েছিল—এগুলো শান্টু জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতটা মানসিক পরিপক্বতা? এমন প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতা? সন্দেহ নেই, মোহনের জীবনের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনাই তাকে এত তাড়াতাড়ি সাবালক করে দিয়েছে। শান্টুর মনে হল। এর কাছে কিছু গোপন করা উচিত হবে না। সে দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, 'না, মানে, আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান লোকটা ভালো নয় কিনা। বাবা পইপই করে বারণ করে দিয়েছে আমি যেন কোথাও কারো কাছে টুঁ-শব্দটি না করি। বাড়িতে ডাগর দুটো বোন রয়েছে। সেইজন্যই তো বড়ভাই, মেজভাই বাড়ি ছেড়ে যায়নি। আড়তে বসেই যদ্দুর পারে, করে। কিন্তু, তুমি বুঝলে কি করে?'

'আমার চাচাতো ভাইরা মুক্তিযোদ্ধা। তারা এপ্রিল মাসেই সীমান্ত পার হয়ে চলে গিয়েছিল। দুই নম্বর সেক্টরে ট্রেনিং নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এখন দেশের ভেতরেই গেরিলা অপারেশন করছে। ওরা কখনো একজায়গায় থাকে না। গ্রামে গ্রামে ওদের কাজ কারবার। ঢাকা থেকে তোমাদের এই গ্রামে আসতে আমার একমাস লেগেছে—'

একমা—স! শান্টু হঠাৎ বুঝতে পারে না কেন একমাস লাগতে পারে। তাই সে বলে ফেলে, 'ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বাসে তো তিনঘণ্টা, তারপর রিকসা করে—'

মোহন আবার হাসে, 'আমরা তো সোজা বাসে আসিনি। ভাইরা যেখানে যেখানে গেছে, অপারেশন করেছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তাই সব দেখেছি, সব শুনেছি। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে তো, প্রায় প্রায় জ্বর, আমাশা লেগেই রয়েছে। তাই ওরা তোমার বাবার আড়তে আমাকে নিয়ে আসে। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি তোমার ভাইরাও এর মধ্যে আছে।'

শান্টু চুপ। কী বলবে সে! এই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেটি সবই জানে, সবই বোঝে। তার কাছে ভান করে লাভ নেই। তার মনের ভার নেমে যায়। যাক্, এর সঙ্গে তাকে আর মিথ্যে বলে বলে না জানার অভিনয় করতে হবে না। সেই সঙ্গে তার নিজেরও যে মুক্তিযুদ্ধে যাবার প্রবল ইচ্ছেটা—যেটা বাবার নানা যুক্তিজালে ও মায়ের অশ্রুপূর্ণ কাকুতি-মিনতির কারণে মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখতে হয়েছে—সেটা নিয়ে এর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যাবে। সে মমতা-মাখা স্বরে বলল, 'এখানে থাকো কিছুদিন, খাওদাও, বেড়াও, ঘুমোও, দেখবে দু মাসের মধ্যেই শরীর সেরে গেছে।'

মোহন পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে যে কথাগুলি বলল, শান্টুর মনে হল বোমার মতো সেগুলি তার কানের পর্দায় এসে ফাটল যেন। মোহন বলল, 'অতদিন দেরি করতে পারব না। দিন পনের বিশ্রাম করেই যুদ্ধে চলে যাব। মেশিনগান দিয়ে নিজের হাতে খানসেনাদের মারব, তারপর আমার শান্তি।'

শান্টু হাঁ-ক্ করে শব্দ করে বলে উঠল, 'ওরে বাপরে! কি অসম্ভব কথা বলছ! তোমার কি যুদ্ধ করার বয়স হয়েছে?'

'আমার বিশ-বাইশ বছরের ভাইদের, আমার আঠারো বছরের বোনের কি মরবার বয়স হয়েছিল? আমার মার কি মরার বয়স হয়েছিল? আমার বাবার?'

শান্টু চমৎকৃত হয়ে মোহনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সত্যি, মোহনের তুলনা হয় না। শান্টুর মা যখন কাঁদতে কাঁদতে শান্টুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুই যে এত ছোট। তোর কি যুদ্ধে যাবার বয়স হয়েছে?' তখন শান্টু তো মার যুক্তি খণ্ডন করে এমন ধারা কোন কথা বলতে পারেনি!

মোহন হঠাৎ শান্টুর হাত চেপে ধরল, 'ভাই, আমার একটা উপকার করবে? মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাবে আমায়?'

ভয়ে এবং বিস্ময়ে শান্টু প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'ওরে বাপরে! আমি কি করে নিয়ে যাব? আমি কি কাউকে চিনি?'

'কেন কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবে না? তোমার ভাইদের?'

'হ্যাঁ, তা হলেই হয়েছে আরকি। ভাইদের জিজ্ঞেস করলে উল্টোফল হবে। বাবা মাকে বলে দেবে আর আমাদের আরো কড়া পাহারায় রাখবে।'

মোহন অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'কিন্তু কেন? আমরা কী এমন ছোট? ষোল বছর বয়স তো যথেষ্ট বড় বয়স। আমি তো অনেক কিছু পারি। আধমণী একটা চালের বস্তা ঘাড়ে তুলে অনেকটা পথ হাঁটতে পারি, পুকুর থেকে বড় বালতি বোঝাই করে পানি বইতে পারি, কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করতে পারি, আমার চাচাতো ভাইদের সঙ্গে থাকার সময় এসব আমি করেছি। এসব তো আগে জীবনে কখনো করিনি। এ সব যদি একমাসে শিখে ফেলতে পারি, তা হলে যুদ্ধ করতে পারব না কেন?'

শান্টু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, তাও তো বটে। সেও তো কোরবাণীর সময় একটা খাসী একলাই পেড়ে ফেলতে পারে। করে না বটে, তবে তার গায়ে যা জোর, তাতে সেও আধমণী ধানের বস্তা, পানি-ভরা বড় বালতি বইতে পারে। তা হলে যুদ্ধ করতে পারবে না কেন? সে বুকটা

একটু টান করে বসল। খানিক ভেবে বলল, 'ভাইদের বলে লাভ হবে না। এখন কিছুদিন আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনব। তা হলে কিছু শুলুক-সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তারপর আমরা নিজেরাই একদিন না-বলে লুকিয়ে পালিয়ে যাব বাড়ি থেকে।'

মোহন মাথা নাড়ল, 'না, পালিয়ে আমি যাব না। এর মধ্যে লুকোছাপার ব্যাপার কিছু নেই। যারা আমার বাবা-মা, ভাই-বোন পুরো ফ্যামিলিটাকে এমনভাবে শুধু শুধু অকারণে মেরে ফেলেছে, যারা সারা দেশের সব জায়গাতেই মানুষ মারছে, গ্রাম জ্বালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নামা তো আমি ফরজ বলে মনে করি। ধরো কালই যদি মিলিটারী এসে এই গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, তোমার বাবা-মা, ভাইদের মেরে ফেলে, বোনদের বেইজ্জত করে, তখন তুমি কি করবে? তখন তো নিশ্চয় উন্মাদের মতো যুদ্ধ করতেই ছুটবে। তাই না? তা হলে সেটা তোমার পরিবারে না ঘটা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকবে? অন্যদের পরিবারে ঘটছে বলে এক্ষুণি যুদ্ধে যাবে না?'

শান্টু সম্মোহিতের মতো মোহনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন তারই বয়সী মোহন কথা বলছে না, যেন তার স্কুলের মাস্টার সাহেব ক্লাসে পড়া বোঝাচ্ছেন। তারই বয়সী, অথচ মোহন এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে; শান্টু তার ক্লাসের ফার্স্ট বয় হওয়া সত্ত্বেও তো পারে না। শান্টু বলল, 'উঃ, মোহন, তোমার সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল।'

মোহন হাসল, দুষ্টুমি করে বলল, 'পারবে কি করে? আমি যে স্কুলের ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলাম।'

নির্ভয়পুর সাবসেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। এত কম বয়স ছেলে দুটির। এখনি মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি হতে চায়। অবশ্য মাথায় বেশ লম্বা আছে। হঠাৎ ঠাহর করা যায় না যে বয়স মাত্র ষোল। একজন একটু রোগা, কিন্তু খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তীব্র দৃষ্টি, গম্ভীর মুখ সব মিলিয়ে বড় বড় ভাব। পাশের ছেলেটার স্বাস্থ্য ভালো হলেও তাকেই বরং কমবয়সী লাগে। কিন্তু মন্টু বলেছে ওরা দুজনেই এক বয়সী।

ছেলে দুটি সেই তখন থেকে এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মন্টু আগেই ওদের কথা বলে রেখেছিল, আজ নিয়ে এসে শুধু পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তার আড়ত ফেলে বেশিদিন বাইরে থাকার উপায় নেই, গঞ্জের লোকেদের সন্দেহ হতে পারে।

ক্যাপ্টেন মাহবুব জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম তোমাদের?'

শান্টু বলল, 'শান্টু'

মোহন বলল, 'নান্টু।'

'তোমাদের ইচ্ছে আর সাহস দেখে খুব খুশি হয়েছি। তবে জান তো, এখানে জীবন ভয়ানক কঠিন। এ তো রেগুলার আর্মির যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এ হল গেরিলার গুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে শত্রু শুধু সামনেই থাকে না, এখানে শত্রু চারপাশে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন তোমাকে ধরিয়ে দেবে, বোঝবার আগেই দেখবে ধরা পড়ে গেছ।'

ক্যাপ্টেন মাহবুব আরো অনেকক্ষণ ধরে গেরিলা-জীবনের বিপজ্জনক ঝুঁকি ও নিদারুণ কষ্ট, মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, জীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ লোমহর্ষকভাবে বলে গেলেন। শুনতে শুনতে শান্টু মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল, কিন্তু মোহন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের পাতাও বুঝিবা পড়ছিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, আর মনে মনে জবাব দিচ্ছিল, 'জীবনটা তো দেবার জন্যই এসেছি। শত্রুর শেষ না দেখা পর্যন্ত ছাড়ব না। এত কথার দরকার কি? যা যা শেখাবেন, সব নির্ভুল শিখব। যা যা নির্দেশ দেবেন, সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

অভিযাত্রা

আজ বুঝি অমাবস্যা। এমন ঘুরঘুট্টি আঁধার যে, দুহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। এরই মধ্যে ওরা ছুটছে প্রাণপণ জোরে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। পায়ের নিচে কাদা-প্যাচপেচে মাঠ না রাস্তা কে জানে, উঁচু-নিচু খানা-খোন্দলে ভরা। ওদের খেয়াল নেই

যে কোথা দিয়ে ওরা ছুটছে। শুধু ছুটছে। পেছনে এখনো চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেলের গুলির শব্দ হচ্ছে। তবে ওরা যে গুলির রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে, সেটা খেয়াল হতে হতে আরো বোধ হয় মাইলখানেক পেরিয়ে তবে থামল। এখন আর পায়ের নিচে কাদা নেই, শুকনো মাঠ। একটু সামনে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে, আন্দাজে বুঝল ওখানটায় বাঁশঝাড়। ওরা সবাই প্রথমে ধপাস্ করে বসে পড়ল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে সবার বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। সবার গা-মাথা-মুখ ঘামে ভিজে জবজবে। ওরা আস্তে আস্তে মাঠেই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশে ছোট ছোট তারা হাজারবুটির মতো ফুটে ঝিক্‌মিক্ করছে। একটুক্ষণ পরে সবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল, গায়ের ঘাম আধাশুকো। হাজার তারার মিটিমিটে আলো চারপাশের আঁধারকে পাতলা করে তুলেছে। ওরা সবাই উঠে বসল। রাকিব চারদিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, 'কোথায় এলাম?' লতিফ বলল, 'মনে হয় যুগীপাড়া গ্রাম।'

শান্টু বলে উঠল, 'উরেব্বাস্‌রে। ক্যাম্প ছাড়িয়ে বহুদূর চ'লে এসেছি।'

মোহন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, 'মাইল দেড়েক মাত্র। চল, আস্তে আস্তে হেঁটে চ'লে যাই।'

সবাই একে একে উঠে দাঁড়াল। মোহন চারদিকে তাকিয়ে দিক ঠিক করে হাঁটা দেবার আগে চাপাস্বরে বলল, 'কে কে আছ, নাম বল।'

'আমি রকিব।'

'আমি লতিফ।'

'রমাপদ।'

'শান্টু।'

'আসাদ।'

'শিবেন।'

আর কোন কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। মোহন বলল, 'আমি নান্টু। তাহলে আরো ছয়জন নেই। হয়তো অন্যপথ দিয়ে ক্যাম্পে চ'লে গেছে, বা, যাবে।'

মোহন অগ্রসর হল। বাকি ছয়জন নীরবে তাকে অনুসরণ করল।

ক্যাম্প মানে রুহিতপুর গ্রামের উপকণ্ঠে বিরাট ঘন বাঁশঝাড়টার গা ঘেঁষে একটা চালাঘরে অস্থায়ী গোপন আস্তানা। অপরদিকে অনেকটা জায়গা ঘিরে সবজি-ক্ষেত ... বর্তমানে বিরান। গ্রামের সম্পন্ন অধিবাসী নবী মিয়ার সবজি-ক্ষেত আর বাঁশঝাড় পাহারা দেবার জন্য এই চালাঘরটা তোলা হয়েছিল কতকাল আগে যেন। পাহারাদারও একটা ছিল মাইনে-করা। এখন কেউ নেই। নিজেদের জান পাহারা দিতেই শশব্যস্ত সবাই, ঝাড়-ক্ষেত পাহারা দেবে কে? তা ছাড়া সবজিই নেই ক্ষেতে। নবী মিয়া নিজের গ্রাম ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে বসে রয়েছে।

চালাঘরের আগলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মোহন, তার পিছে বাকি ছয়জন। মোহন খুব আস্তে একটা শিস্ দিল, ঘরের ভিতর থেকে অনুরূপ শিসের ধ্বনি শোনা গেল। মোহন দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নাম বল।'

'আমি সুলতান।'

'আমি হাসান।'

'আবদুল্লা।'

'মমিন।'

'রডারিক।'

পাঁচটা নামের শব্দ অন্ধকারে হালকাভাবে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। তারপর নীরবতা। মোহন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'শুধু আমিন বাকি।'

মোহনের পিছু পিছু সবাই ঘরে ঢুকে খড়-বিছানো মেঝেতে বসে পড়ল। শান্টু বলে উঠল, 'যা জব্বর ক্ষিধে একখানা পেয়েছে। হাশিমুদ্দি আছ নাকি ঘরে?'

মমিন হি হি করে হেসে বলল, 'থাকলে তো নামই বলত।'

রমাপদ বলল, 'হয়তো জল সারতে গেছে কাছে কোথাও। এসে যাবে এক্ষুণি। এই ফাঁকে হাত-মুখ ধুয়ে এলে হ'ত না?'

সবজি-ক্ষেতের ওপাশে একটা ছোট ডোবা, সেইখানেই এরা সবাই ধোয়া-পাকলা, গোসল, কাপড়-কাচা ... সবই সারে।

মোহন বলল, 'দুজন করে যাবে। দুমিনিটের বেশি সময় নেবে না। সাবধানে চারদিকে খেয়াল রেখে বেরোবে।'

শিবেন ঘরের একটা কোণে উঠে গেল। ওইখানে মাটিতে উবু হয়ে বসে দেয়ালের কোণায় মুখ লুকিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। রাত্রিবেলা চালাঘরের ভেতরে কুপি, মোম বা দেশলাই জ্বালানো নিষেধ। ভাঙাচোরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে, জানালার ফোকর দিয়ে আলোর আভাস বোঝা যাবে দূর থেকে। তাহলে বিপদ আসতে পারে। রুহিতপুরে শান্তি কমিটির মেম্বার, রাজাকার ভর্তি। গ্রামের সবাই জানে এটা পোড়ো চালাঘর ... কেউ থাকে না এখন।

শিবেন সিগারেট হাতের মুঠোয় আড়াল করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে টানতে লাগল। রমপাদ, লতিফ আর রকিব ওর দুইপাশে গিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মাটিতে বসে পকেট থেকে সিগারেট বের করে শিবেনের সিগারেটের আগুন থেকে ধরিয়ে নিল। মোহন, শান্টু, আসাদ সিগারেট খায় না। মোহন বলল, শান্টু, আসাদ তোমরা হাতমুখ ধুয়ে এস। কুইক। হাশিমুদ্দির ফিরতে দেরি হলে তোমরা খাবার বেড়ে দেবে সবাইকে।'

শান্টু বলল, 'হাশিমুদ্দি কোথায় কি রেখেছে, অন্ধকারে খুঁজে পাব কি করে?'

মোহনের গলায় অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল, 'আমি জানি কোন জায়গাটায় খাবার থাকে। পেনসিল টর্চ আছে না!'

শান্টু, আসাদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মোহন তখনি উঠে মেঝেয় রাখা একটা ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পেনসিল টর্চ বের করে ঘরের একটা বিশেষ জায়গায় দেয়ালের কাছে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল। এইখানে মেঝেয় কয়েকটা ইট পাতা আছে, সেখানে একটা ভাতের ডেকচি, কয়েকটা টিনের থালা, গেলাস, গুঁড়ো দুধের টিন, একটা মাটির কলসি ... এসব থাকে। এখানে এসে মোহন মাটির দিকে লক্ষ্য করে পেনসিল টর্চের বাতি ফেলল, ভাতের ডেকচিটার ঢাকনা খোলা এবং ভেতরটা শূন্য। অর্থাৎ বিকেলে সূর্যডোবার আগে হাশিমুদ্দি ভাত রেঁধে রাখে নি। কেন? কী ঘটল যে ভাত রাঁধতে পারে

নি? মোহনের পেটের ভেতরটা হঠাৎ পাক দিয়ে উঠল, একই সঙ্গে ক্ষিধেয় এবং অজানা আশঙ্কায়। হাশিমুদ্দিই বা গেছে কোথায়? তার তো সন্ধের পর থেকে এই ক্যাম্পের ভেতরেই থাকবার কথা। তাকেই আপাতত ওরা এখানকার পাহারাদার বানিয়েছে। গ্রামের সন্ধিগ্ধ-চিত্ত কেউ যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে, হাশিমুদ্ধি যাতে বলতে পারে যে নবী মিয়া তাকে পাহারা দেবার জন্য এখানে থাকতে বলেছে। নবী মিয়া তো গ্রামে নেই, কে আর যাচাই করবে।

ডেকচির আশেপাশেও টর্চের আলো ফেলে দেখল অন্য কোন খাবার আছে কিনা। না নেই, না মুড়ি, না চিড়ে, না কিছু। একটা টিনে শুধু খানিকটা আখের ঝোলা গুড়। তার মানে, সেই যে সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, সেইটের কথা মনে করেই পেট চাপড়ে থাকতে হবে আজ রাতটা। কিছুটা চাল এখনো আছে ঘরে। কিন্তু এত রাত্রে চুলো জ্বেলে রাঁধবার উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে দূর থেকে গ্রামের চৌকিদারের চোখে পড়লে বিপদ হবে।

শান্টুরা ফিরে এসে দুঃসংবাদটা নীরবেই গ্রহণ করল। তারপর মোহনের নির্দেশে দুজনে দুটো থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল তুলে নিয়ে জানালা আর দরজার সামনে সেন্ট্রি-ডিউটিতে দাঁড়িয়ে গেল। মোহন বলল, 'আমিন এখনো ফিরল না। হাশিমুদ্দিরই বা কী হল?'

শিবেন কোণা থেকে উঠে এসে মোহনের সামনে মেঝেতে বসল। বলল, 'ছুটতে ছুটতে কোন দিকে গেছে, হয়তো অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে ভোরে এসে হাজির হবে। রাতটা তাহলে হরি-মটর? শুয়ে পড়া যাক।'

মোহন বলল, 'শুয়ে পড়া কি ঠিক হবে? হাশিমুদ্দির উধাও হওয়াটা আমার ভালো ঠেকছে না। সে গ্রামে গিয়ে কোথাও ধরা পড়ল কিনা, তা তো আমরা জানি না। তারপর আমিন। তার কী হল? জখম না হলে বা ম'রে না গেলে তার ক্যাম্পে অবশ্যই ফিরে আসার কথা। সে যদি অমন ছুটতে ছুটতে গ্রামের ভেতরে কোন রাজাকারের সামনে গিয়ে পড়ে, তা হলে—'

শিবেন ছটফটিয়ে বলে উঠল, 'এখনই পালানো উচিত। আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

শান্টু দরজার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, 'এত ক্ষিধে নিয়ে এখন মোটেই হাঁটতে পারব না। পায়ে একফোঁটা জোর নেই।'

হঠাৎ দরজার বাইরে মৃদু শিস্ শোনা গেল। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে সবাই স্তব্ধ হয়ে যে যার অস্ত্র হাতে তুলে নিল। শান্টু বিদ্যুৎগতিতে রাইফেলের মুখ দরজার বাইরে তাক করে টান টান হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে হাশিমুদ্দির গলা শোনা গেল, 'আমি হাশিমুদ্দি'; তারপরই সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। শান্টু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উদ্যত রাইফেল নামিয়ে নিল। ঘরের ভেতরে প্রায় চার-পাঁচ জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার? কোথায় হাওয়া হয়েছিলে? এদিকে আমাদের তো বারোটা বেজে গেছে।' সাবাই ঠাণ্ডা হলে হাশিমুদ্দি জানাল, ব্যাপারটা কিছুই নয়। সে হাওয়া হয়নি। গ্রামের ভেতরে খালার বাড়ি গিয়েছিল কিছু ডাল আর আলু জোগাড় করে আনতে। ক্যাম্পে তো চাল ছাড়া আর কিছুই নেই। গেছিল তো সেই দুপুরেই। কিন্তু খালার বাড়ি গিয়ে ফেঁসে গেল। খালার ছোট মেয়েটার হঠাৎ এমন জ্বর উঠে গেল, চোখ উল্টে খাবি খেয়ে যায়-যায় অবস্থা। তখন খালাকেই সামলাবে না মেয়ের মাথায় পানি ঢালবে, না দোকানে খালুকে খবর দেবে ... হাশিমুদ্দি আর দিশে-ভিশে পায়নি। কখন যে সন্ধে হয়ে গেছে। খালা আবার ভাত না খেয়ে আসতে দিল না—

মোহন থামিয়ে বলল, 'থাক, থাক, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। তা গ্রামে কোথাও কোন উত্তেজনা দেখেছ কি? আমিন ফেরেনি। সে ওদিক পানে যায়নি তো?'

হাশিমুদ্দি খানিক চিন্তা করে তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, গ্রামে কোথাও কোনরকম উত্তেজনা সে দেখেনি। আমিন গ্রামের ধারে কাছেও যায় নি। গেলে একটা হৈ চৈ অবশ্যই পড়ে যেত। আর সেটা অবশ্যই হাশিমুদ্দির চোখে পড়ত।

মোহন বলল, 'রাতটা তা'হলে এখানেই কাটানো যেতে পারে। কাল একদম সুবেসাদেকের সময় ক্যাম্প ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। এখন শোবার আগে মিটিংটা সেরে

নিই। সবাই কাছে এসে গোল হয়ে বস। হাশিমুদ্দি তুমি শান্টুর রাইফেলটা নিয়ে দরজায় দাঁড়াও।'

নীরবে এবং নিঃশব্দে সবাই এসে মোহনের চারপাশ ঘিরে বসল। মোহন বলল, 'আজকের অ্যামবুশের সময় আমার সিগন্যাল পাবার আগেই আমাদের মধ্যে কেউ একজন নার্ভাস হয়ে গুলি করে বসে। তার ফলেই আজকের বিপর্যয়টা ঘটে। আমি কাউকে দোষারোপ করার জন্য জিজ্ঞেস করছি না। আজকের অ্যামবুশের দোষত্রুটিগুলো আলোচনা করতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে এই রকম ভুল আর না করি। কার বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গেছিল, সে শুধু বলুক।'

কেউ জবাব দিল না। সবাই চুপ করে সূর্যাস্তের পরের দুর্ঘটনাটার কথা স্মরণ করল।

তিসি নদীর পাড় ঘেঁষে আখের ক্ষেত, সেই ক্ষেতে তারা তেরো জনে উপুড় হয়ে শুয়ে পজিশন নিয়েছিল। সকালে ওইপথ দিয়ে ঘর-পোড়ানো লঞ্চটা উত্তর দিকে গেছে। কে জানে, কোন গ্রাম পোড়াতে। ওটা আসলে স্পীডবোট, ওইরকম স্পীডবোটে করে পাকিস্তানি সৈন্যরা ছোট ছোট খালের মতো নদী দিয়ে গ্রামে ঢোকে, গ্রাম পোড়ায়, তাই ওরা ওগুলোর নাম দিয়েছে ঘর-পোড়া লঞ্চ। সূর্যাস্তের সময় এই পথ দিয়েই ফিরবে। ওরা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ একটু দেরি হচ্ছিল। সূর্য ডুবে পাতলা আঁধার ছড়িয়ে পড়ছে। মোহনের নির্দেশ ছিল সে সংকেত না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না। সংকেত মানে প্রথম গুলিটা সে ছুঁড়বে, তারপর অন্যরা। সাতজনের হাতে সাতটা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, পাঁচজনের হাতে গ্রেনেড, মোহনের হাতের রাইফেল ও একটা ফসফরাস গ্রেনেড। গ্রেনেড হাতে ছেলেরা মোহনের কাছাকছি ছিল। মোহনের প্ল্যানটা এরকম ছিল—স্পীডবোডটা কাছাকাছি এলে প্রথমে তারা মোহনের হাতের নির্দেশে গ্রেনেড ছুঁড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মোহন ফায়ার ওপেন করবে এবং তখন অন্যরা গুলি করা শুরু করবে। ফসফরাস গ্রেনেডটা মোহন

রেখেছিল সবশেষে ছোঁড়বার জন্য, যাতে স্পীডবোটটা আগুন লেগে পুড়ে যায়। স্পীডবোটটা আজ ফিরতে দেরি করছিল। সেইজন্যই বোধ হয় সবাই উদ্বেগে উচাটন হয়ে ছিল। হঠাৎ একটু দূরে স্পীডবোটটার ভটভট আওয়াজ শোনা গেল। মোহনের শরীর টানটান হয়ে ওঠে। সে স্পীডবোটটা আরো সামনে এগিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ সে একটা গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠল। বুঝল তার দলের কেউ একজন ঘাবড়ে গিয়ে মোহনের নির্দেশের কথা ভুলে গুলি করে বসেছে। ভুলটা মোহন বুঝতে পারলেও রাইফেল-হাতে অন্যান্য ছেলেরা ভাবল ওটা মোহনেরই গুলি। সবাই তৎক্ষণাৎ গুলি করতে শুরু করে। কিন্তু পাক সৈন্যদের ঠিক অতর্কিতে বাগে পাওয়া গেল না। তারাও সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গুলি চালায়। গ্রেনেড হাতে ছেলেরাও কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে যায়, ফলে তাদের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডগুলো কয়েকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সলিল সমাধি লাভ করে। তবে মোহনদের কপাল ভালো, তাদের গুলিতে প্রথমেই ঘায়েল হয়ে পড়ে যায়, যার হাতে এলএমজি ছিল সেই সৈন্যটা এবং স্পীডবোটের চালকটা। ফলে স্পীডবোটটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীর ওই পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পাড়ের মাটিতে কাত হয়ে যায়। তখন মিলিটারিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে ওইদিককার আলে পজিশন নিয়ে গুলি করতে শুরু করে। কিন্তু তার আগেই অর্থাৎ স্পীডবোটটা কাত হওয়ার পরে সৈন্যগুলোর নেমে আলে পজিশান নিতে যে কয় সেকেন্ড সময় লাগল, সেই ফাঁকেই মোহন ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ফসফরাস গ্রেনেডটা ছুঁড়ে মারল এবং একই সঙ্গে চাপা কণ্ঠে সবাইকে উঠে পালাতে নির্দেশ দিল।

পুরো ঘটনাটা মোহন ধীরস্বরে আবার বর্ণনা করে বলল, 'প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়িনি। আমার সংকেত পাবার আগেই অন্য একজন ভয় পেয়ে ছুঁড়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল ঘর-পোড়া লঞ্চটা আমাদের ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে আসার আগেই। সামান্য কয়েক মিনিট সময়ের হেরফেরে আমাদের অ্যামবুশটা ব্যর্থ হয়ে গেল। তা না হলে আমরা আজ অনেকগুলো শয়তান মারতে পারতাম। লঞ্চে শুধু পাকসেনাই ছিল না, রাজাকারও ছিল। আমি জানতে চাই, কে গুলি ছুঁড়েছিল? বল।'

সবাই চুপ করে রইল। মোহন বলল, 'আরো একটা ব্যাপার বোধ হয় তোমরা কেউ খেয়াল করনি। আজ আমরা সবাই ওদের গুলিতে মারা যেতে পারতাম। ওদের সঙ্গে এলএমজি ছিল একটা, বাকিগুলো চাইনিজ অটোম্যাটিক রাইফেল। আমাদের গুলিতে প্রথমেই ওই এলএমজি-ম্যান আর লঞ্চের সারেং মারা না পড়লে আমাদের বাঁচার কোন আশা ছিল না। ওই দুজনের মারা পড়াটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। বুঝতে পারছ তো, কমান্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে না মানলে কি ভয়ানক বিপদ হতে পারে?'

শিবেন বলল, 'আমিনের হাতেও রাইফেল ছিল। সে আসুক—' বলে চুপ করে গেল।

মোহন আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বাকিরাও একে একে শুয়ে পড়ল। খানিক পরে মোহন মৃদুস্বরে বলল, 'হাশিমুদ্দি, কাল খুব ভোরে উঠে ভাত রান্না করবে। আমিন ভোরের মধ্যে না ফিরলে শিবেন, শান্টু, লতিফ, রকিব, আবদুল্লা আর আমি যাব খুঁজতে।'

মমিন বলল, 'আমিও যাব।'

মোহন কড়াসুরে বলল, 'না, তুমি হাশিমুদ্দিকে রান্নায় সাহায্য করবে।'

মমিন আমিনের ভাই। শান্টু চমৎকৃত হল মোহনের দূরদর্শিতায়। যদি আমিনের কিছু হয়ে থাকে, মমিনের তাদের সঙ্গে না থাকাই ভালো।

আখক্ষেতের ভেজা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল আমিন। পেছন থেকে গুলি ঢুকেছে সরু হয়ে, সামনের দিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে বিরাট গর্ত, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে পড়েছে। তার পেছনে কিছুটা দূর পর্যন্ত রক্তের রেখা মাটিতে। বোঝা গেল, গুলি খাবার পরও সে খানিকটা পথ ছুটে এসে তারপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার দেহের নিচে রক্ত গড়িয়ে কাদাপানিতে মিশে আখের ঝোলা গুড়ের মতো দেখাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় রক্ত জমে থকথকে হয়ে রয়েছে। আমিন মাটিতে মুখ গুঁজে পড়েছে একেবারে সোজা সটান। ফলে দেহটা শক্ত হয়ে গেলেও তাকে বয়ে আনতে

মোহনদের বিশেষ কষ্ট হয়নি। খুঁজে পাবার পর কয়েকটা মিনিট সবাই যে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর দ্রুত তিনজন করে লাশের দু' পাশে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে তুলে বয়ে নিয়ে চলে আসে ক্যাম্পে। তখনো ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। মোহন পুকুরপাড়ে থেমে বলল, 'লাশ এখানেই নামাও। পুকুরে একেবারে ধুয়ে নিই। শান্টু, শিবেন, হাত ধুয়ে ভেতরে গিয়ে মমিনকে ঘরে ঢুকিয়ে ফেল। যেন চিৎকার দিতে না পারে। রফিক, লতিফ, তোমরা হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি এই বাঁশঝাড়ের গোড়ায় একটা কবর খুঁড়ে ফেল। একঘণ্টার মধ্যে লাশ দাফন করে, খাওয়া শেষ করে ক্যাম্প ছাড়তে হবে। মিলিটারিরা সূর্য ওঠার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বেরিয়ে এসে এ গ্রাম পোড়াবে। কাল ওদের লঞ্চ নষ্ট করেছি, কয়েকজনকে মেরেছি। তার শোধ আজ তুলবে। আফশোস, সবগুলো শয়তানকে মারতে পারলাম না।' শিবেন চট করে চোখ নামিয়ে ফেলল। মোহন একমুহূর্তে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'সবাই তাড়াতাড়ি কর। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছ তো?'

শান্টু, শিবেন যতটা আশঙ্কা করেছিল, মমিন সে রকম কান্নাকাটি করল না। একবার মাত্র 'ভাইগো' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরল। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি ওকে গোসল দেব। আমার এই চাদরটা দিয়ে কাফন পরাব।'

খুব দ্রুত লাশ দাফন করে সবাই পুকুরে গোসল করে নিল। সবার মুখ শক্ত, কেউ কাঁদছে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে হাশিমুদ্দি ভাত রান্না করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছে। সবাই ঘরে ঢুকতে হাশিমুদ্দি বলল, 'আজ শুধু ভাত আর গুড়। ডাল, আলু কিছু নেই গো।'

কেউ কোন জবাব দিল না। মাঝে মাঝেই এরকম ভাত, নুন আর আখের ঝোলা গুড় মেখে খেতে হয় ওদেরকে। খাওয়ার জন্য তো খাওয়া নয়। চলার জন্য, অপারেশান-অ্যাকশান-অ্যামবুশ করার জন্য, কোনমতে পেটে কিছু ঠেসে পোরা। রাইফেলে গুলি পোরার মতো। গুলি না পুরলে রাইফেল চলবে না। পেটে ভাত না পুরলে দেহ চলবে না। মমিন শুদ্ধ শান্তভাবে ভাতের থালা নিয়ে

বসে গেল। কিন্তু ঐ বসা পর্যন্তই। সবাই ভাতের সঙ্গে নুন আর গুড় চটকে নিয়েছে কিন্তু কেউ খেতে পারছে না। এত প্রচণ্ড ক্ষিদে পেটে, গতকাল সকালের পর থেকে আর খাওয়া জোটেনি। তবু কেউ যেন মুখে তুলতে পারছে না, সবাই চটকাচ্ছে। সবার ভেতরে প্রচণ্ড কান্না উথালপাতাল করছে। কিন্তু কেউ চোখে একফোঁটা পানি আসতে দিচ্ছে না। সাদা ভাতে ঝোলা গুড় মাখার ফলে কেমন একটা লালচে রং হয়েছে,শান্টুর মনে হল আখের ক্ষেতে পড়ে থাকা আমিনের দেহের চারপাশে গড়ানো রক্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে এইরকম দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তার পেট গুলিয়ে উঠল। সে দ্রুত উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে বমি করে ফেলল। মোহন একবার গম্ভীর মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল, তারপর যেন জেদ করেই গপাগপ ভাত মুখে তুলতে লাগল। এই ছেলেগুলো এখন যদি দুই তিন গ্রাস করেও পেটে দিতে না পারে, তা হলে পালাবার জন্য বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবে না। তারও বমি পাচ্ছিল কিন্তু অন্য ছেলেদের কথা ভেবেই সে ভাত মুখে তুলতে লাগল।

মমিন এতক্ষণ চুপ করে ভাত চটকাচ্ছিল, হঠাৎ তার কী যে হল, ভাতমাখা হাত নিয়েই সে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনের ওপর। হিস্ হিস্ করে বলতে লাগল, 'আয়, তোকে জন্মের খাওয়া খাওয়াই।' তার দেহের ভারে মোহন কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল, মমিন তার থালা থেকে মুঠোভর্তি করে ভাত তুলে মোহনের নাকেমুখে ঠেসে ধরল। অমনি রকিব, লতিফ, রমাপদ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে মমিনকে ছাড়িয়ে নিল, একজন মোহনকে তুলে বসিয়ে তার নাকমুখ থেকে ভাত পরিষ্কার করতে লাগল। মোহন খাবি খেয়ে, নাক ঝেড়ে, কোনমতে সুস্থির হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল পুকুরে হাতমুখ ধোয়ার জন্য। তারপর ফিরে এসেই কড়াকণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'পনের মিনিটের মধ্যে সব গুছিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে ডবল মার্চ। নদীর উল্টোদিকে ছুটতে হবে। প্রথমে বেলতলীর ক্যাম্পে যাব। তারপর দুই নম্বর সেক্টর। কতোটা যে ঘুরপথ হবে, কে জানে।

লতিফ বলল, 'বেশ ঘুরপথ হবে। তবে যদি অমত না কর, মাঝপথে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা হতে পারে। উত্তর-পূর্ব কোণা দিয়ে

হেঁটে সিকিমাইল গেলে একটা ছোট জঙ্গলের মতো পড়বে। ওই পর্যন্ত দৌড়ে যাই, চল। তারপর জঙ্গল পেরিয়ে হাওর, জন-মনিষ্য খুব কম। ওটার পরে রতনপুর গ্রামে আমার চাচা থাকে। তার বড় জামাইও মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের লোকগুলো খুব ভালো। চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষের লোক। ক'মাস আগে মিলিটারিরা তাদের পাড়া জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাই তারা বেজায় খাপ্পা ওদের ওপর। মুক্তিযোদ্ধা দেখলেই আশ্রয় দেয়, খাওয়ায়।'

মোহন রাজি হল। বিশ্রামের চেয়েও বেশি দরকার ডাল ভাতের। গতকাল সকালের পর থেকে তো খাওয়া নেই। চাচার বাড়িতে খেয়ে একটু গড়িয়ে তা হলে রাতেই আবার রওনা দিতে পারবে।

ওরা জঙ্গল পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে গেল। ততক্ষণে চারদিকে সকালের আলো ফুটে উঠেছে। জঙ্গলের পর হাওর ... তারপরে রতনপুর গ্রাম। একবার পোড়ানো হয়ে গেছে, অতএব এ গ্রামে অন্তত আজকে মিলিটারি আসার ভয় নেই।

লতিফের চাচার বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে দুপুর পেরিয়ে গেল। ততক্ষণে ও বাড়িতে সবার খাওয়া হয়ে গেছে। লতিফের চাচা সোলেমান মিয়া ওদের দেখে একই সঙ্গে খুশি এবং ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মোরগ জবাই করতে বললেন। শান্টু বলে উঠল 'না চাচা, মোরগ রান্না হতে সময় লাগবে। দুটো চুলোতে শুধু ডাল ভাত বসিয়ে দিতে বলুন। ওতেই আমাদের হবে। কাল থেকে কেউ খাইনি।'

সোলেমান মিয়া হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কিযে বলে ছেলে। ব্যস্ত হোয়ো না, সব হবে। তাড়াতাড়িই সব দেব নে। তোমরা বাবারা হাতমুখগুলো ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো দিকিনি। ওই যে পাশে পুকুর আছে, যাও, সব হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

হাতমুখ ধোবে কি, সবাই পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোসল করার জন্য। গত সন্ধ্যার অমন রাম-ছোটার সময় কতো যে কাদামাটি লেগেছিল গায়েপায়ে, ডোবার পানিতে হাতপা ধুয়েও সেগুলো যায়নি। তা ছাড়া আজ এতখানি পথ হেঁটে আসা বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে করে। সবাই ঘেমে একসা। অনেকক্ষণ ধরে

ঝাঁপাই-ঝুড়ি করে গোসল সেরে ওরা দহ্লিজ ঘরে ঢুকে দেখে তক্তপোষের ওপর জগ-ভর্তি শরবত, কয়েকটা গেলাস আর একটা বেতের ধামিতে কয়েকটা মুড়ির মোয়া।

সোলেমান মিয়া বললেন, 'এখন বেশি কিন্তু দিলাম না ভাতের ক্ষিদে মরে যাবে বলে। শুধু একটা করে মোয়া খেয়ে শরবতটুকু গলায় দাও। এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাত দেব নে।'

সত্যি সত্যিই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওদের ডাক পড়ল ভাত খাবার জন্য। ভেতর-বাড়ির চওড়া বারান্দায় পাটি পেতে জায়গা করা হয়েছে। সার সার থালার সামনে তিন চারটে বড় বড় গামলায় ভাত, মাছ ভাজা, মোরগের ঝোল, ডাল, লাউ-ভাজি নিয়ে লতিফের চাচী রহিমা বিবি বসে আছেন। ওরা একে একে ঢুকতেই তিনি মাথার কাপড়টা আরো একটু সামনে টেনে দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন। ওরা পাটিতে বসার পর চোখ পড়ল ভাত-তরকারি ভর্তি গামলাগুলোর দিকে। দেখে ওদের চক্ষু স্থির। শান্টু হাঁ-ক্ করে নিঃশ্বাস টেনে বলে উঠল, 'করেছেন কি চাচাজান? একঘণ্টার মধ্যে এ-ত আয়োজন!'

সোলেমান মিয়া খুশির হাসি হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কিছু না বাবারা, এইসব কিছু না। তোমরা রোদে-বৃষ্টিতে, কাদায়-পাঁকে এমন কষ্ট করছ আর বাড়ির মধ্যে এতগুলো আকামের ধাড়ি বসে বসে খাচ্ছে, এইটুকু রেঁধে দিতে পারবে না। কইরে বেলী, ফুলী, হেনা, বকুল, কই তোরা, খাবার দে ছেলেদের পাতে।'

এতক্ষণে 'আকামের ধাড়িদের' দেখা গেল। তিনটি কিশোরী মেয়ে এগিয়ে এসে ওদের পরিবেশন করতে শুরু করল। সব ছোটটি মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। রহিমা বিবি বসে বসে তদারক করতে লাগলেন, 'ওই পাতে মাছভাজা দে। এইখানে ভাত লাগবে। খাও বাবারা খাও, লজ্জা করো না। আবার কতখানি পথ না জানি হাঁটতে হবে।'

ওরা সবাই মাথা নিচু করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে খেল। সোলেমান মিয়া বললেন, 'তোমরা দহ্লিজঘরে শুয়ে একটু জিরিয়ে নাও।'

মোহন বলল, 'যদি ঘুমিয়ে পড়ি, সন্ধের সময় জাগিয়ে দেবেন। আজ রাতেই বেলতলী পৌঁছতে হবে।'

সোলেমান মিয়া বললেন, 'তোমার শরীর গতিক বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না। একটু বিশ্রাম দরকার। আজ রাতটা এখানে থেকে গেলে হ'ত না?'

সামান্য একটু স্নেহের সুর। একজন প্রবীণ পিতার স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ও দরদ। মোহনের বুকের ভেতর উথাল-পাথাল করে উঠল। ভেতরের সব আবেগ যেন বাষ্প হয়ে দুই চোখের কূলে এসে জমা হতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে মোহন বলল, 'না চাচা, আজ রাতেই বেলতলী পৌঁছনো খুবই জরুরি। আমাদের গুলি আর বেশি নেই। আমিনের রাইফেলটা খোয়া গেল। বেলতলীর ক্যাম্প কমান্ডারের কাছে গিয়ে সব জানাতে হবে। আরো অস্ত্র নিতে হবে। দিনের বেলা বেলতলী যাবার রাস্তাটা নিরাপদ হবে না। আপনি ভাববেন না, বেলতলী পৌঁছে ভালো করে ঘুমিয়ে নেব।'

কমান্ডার রফিক বলল, 'আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও খুব কমে গেছে। আমাকেও নির্ভয়পুরে যেতে হবে। এখানকার ক্যাম্পটা বোধহয় আর রাখা যাবে না। চারপাশে হঠাৎ এত রাজাকার বেড়ে গেছে।'

শুনে মোহনের একটু দুঃখ হল। নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর থেকে ট্রেনিং নিয়ে সে প্রথমে এই বেলতলীর গোপন আস্তানায় এসে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের খুব শক্ত একটা ঘাঁটি ছিল এটা, বলা যেতে পারে। চারপাশের গ্রামগুলোয় তখনো বিশেষ মিলিটারি হামলা হয়নি, গ্রামের লোকেরাও যেন দেখেও দেখত না রসুল মিয়ার বাড়িতে এত 'আত্মীয়-স্বজনের' আনাগোনা কেন! এই আস্তানায় সে প্রায় পনেরদিন ছিল। রফিকের সঙ্গে নানা অপারেশনে গেছে। তারপর রফিকেরই নির্দেশে সে বারোজনের দল নিয়ে রুহিতপুরের উপকণ্ঠে অস্থায়ী গোপন আস্তানা গেড়েছিল। তা তিসি নদীর লঞ্চ অ্যামবুশের ব্যর্থতার ফলে সে আস্তানাও ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। খবর পেয়েছে, পরদিনই মিলিটারিরা রুহিতপুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

রফিক বলে চলল, 'আমাদের দলেরও দুটো ছেলে শহীদ হয়েছে। ছেলেদুটো অবশ্য কাছাকাছি কোন গ্রামের নয়, তাই এ এলাকাটায় হৈ চৈ হয়নি। কিন্তু রসুল মিয়াকে আজকাল গ্রামের অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞেস করছে। আমরা কালই নির্ভয়পুর রওনা দেব।'

মোহন রফিকের কথায় বিপদের গন্ধ পেল। নির্ভয়পুর থেকে বেরিয়ে বর্ডার পার হলে সবচেয়ে কাছে হয় বেলতলীর এই গোপন আস্তানা। ওখান থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলারা দেশের ভেতরে ঢুকে অনেকেই প্রথমে এই বেলতলী ক্যাম্পে আসে। এখন আর আস্তানা নিরাপদ নয়। যে কোন দিন মিলিটারির হামলা হতে পারে। একবার এই আস্তানা রেইড হলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে ক্যাম্প বন্ধ করে সাব-সেক্টরে গিয়ে রিপোর্ট করাই ভালো। সাব-সেক্টর থেকেও মানা করে দেওয়া হবে, কেউ যেন আর বেলতলীর দিকে না যায়।

ক্যাপ্টেন মাহবুব খুব নির্লিপ্তভাবে সমস্ত রিপোর্ট শুনলেন। তারপর শুধু বললেন, 'ঠিক আছে রফিক। তোমরা অনেক পথ হেঁটে এসেছ। খুব ক্লান্ত নিশ্চয়? যাও, বিশ্রাম করো গে। দেখ, খাবার-দাবার কিছু আছে নাকি। কাল সকালে কথা হবে।'

রফিক স্যালুট করে পেছন ফিরল। তার পেছনে বাকিরা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও পেছন ফিরল।

সন্ধে সাতটা বাজতে বাজতে ক্যাম্পের সবার খাওয়ার পাট চুকে যায়। কিচেনে হাঁড়ি-ডেকচি সব ধুয়ে উপুড় করে রাখা। তবু খাওয়া জুটে গেল। সাব-সেক্টরের ছেলেরা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে পাউরুটি, বিস্কুট, কলা, যে যা পারে, চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে ওদের খেতে দিল। খাবার পর্যাপ্ত ছিল না। পেট না ভরলেও তারপরে গ্লাস-ভর্তি পানি পেটের শান্তি আনতে কিছুটা সহায়তা করে।

ছেলেদের থাকার জন্য তাঁবু আর লম্বা বাঁশের ব্যারাক। রফিকের সঙ্গে আগত চব্বিশজন গেরিলাকে সবাই ভাগ ভাগ করে ব্যারাকে ও তাঁবুতে শোবার ব্যবস্থা করে দিল। মোহন আর শান্টু পাশাপাশি

শুয়েছে। দলের অন্যান্যরা যে-যার পুরনো বন্ধুর কাছাকাছি শুয়েছে। শান্টু ফিসফিস করে বলল, 'ক্যাপ্টেন বেজায় রেগেছে, তাই না মোহন?' মোহনও ফিসফিস করে বলল, 'কিসে বুঝলে?'

'একটাও কথা বলল না যে। অল্প রাগলে বকে ভূত ছাড়িয়ে দেয় না? বেশি রাগলে চুপ মেরে যায়। রাগবেই তো। আমরা কেউই এবার ভালো করিনি।'

মোহন চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন মাহবুব এইরকমই। গম্ভীর আর কড়া প্রকৃতির মানুষ। কথা কম বলে, মনের ভাব বোঝা খুব শক্ত। ছেলেদের হাতে ধরে গেরিলা ট্রেনিং দেয়, অনেক কঠোরতা এবং অনেক যত্নের সঙ্গে। ছেলেদের জান বেরিয়ে যায়। খালি শেখায়, খাটায়, কিন্তু ছেলেরা ভালো করলে সহজে প্রশংসা করে না। আবার ভুল করলে বকে বকে ভূত ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেরা ওকে ভয়ানক ভালোবাসে। অসম সাহসী, দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন মাহবুবের সঙ্গে অপারেশনে যাবার জন্য ছেলেরা একপায়ে খাড়া থাকে, কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে কারো বলার সাহস নেই। মাহবুব যাকে যাকে বাছবে, কেবল তারাই যাবে। কোনো ছেলে যদি মুখ ফুটে তার অ্যাকশানের সঙ্গী হবার বাসনা প্রকাশ করে, তবে তার বারোটা বেজে গেল। মাহবুব পরবর্তী দু'দিন ধরে তাকে হয় ফেটিগ্ না হয় সেন্ট্রি ডিউটিতে দিয়ে দিল। কোনো নতুন ছেলে সাব-সেক্টরে এলে তার ব্যাপারেও প্রথমে এই প্রেস্ক্রিপশন! ফেটিগ্ খাটাও। মোহন আর শান্টু আসার পর এক সপ্তাহ কেবল কাঠ কেটেছিল আর ক্যাম্পের মাঠের আগাছা সাফ করে এবড়ো খেবড়ো মাঠ কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সমান করেছিল। শান্টু দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিল কিন্তু মোহনের মুখে রা-টি ছিল না। একাগ্র মনোযোগে সে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করত। একসপ্তাহ পরে শুরু হল তাদের গেরিলা ট্রেনিং। তখন দলে পেল এই শিবেন, রমাপদ, আসাদ, লতিফ, রফিক, আমিন, মমিন, সুলতান, হাসান—এদেরকে। এরা সবাই নতুন রিক্রুট।

একমাসের ট্রেনিংয়ের সময়ে প্রতিটি বিষয়ে মোহন ফার্স্ট। তাকে একবার শুধু দেখিয়ে দিলেই হয়, সেটা যেন সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গেঁথে যায়। তারপর অবসর সময়ের সবটুকু সে বারবার

প্র্যাকটিস করেই ব্যয় করে। তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, একঘেয়েমি নেই। অন্য ছেলেদের মতো স্বাধীন বাংলা বেতারে বা টেপরেকর্ডারে গান শোনার আগ্রহ নেই। খাওয়ার পরে ব্যারাকে সবাই মিলে বসে যখন আড্ডা দেয়, গান করে, তখনো সে কিছু একটা প্র্যাকটিস করছে।

তার এইরকম অধ্যবসায় দেখে ক্যাপ্টেন মাহবুব যে খুব প্রীত হলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রায় সবগুলি অ্যাকশানেই তিনি মোহনকে সঙ্গে নিতে শুরু করলেন। মোহনের প্রতি ক্যাপ্টেনের এই সস্নেহ প্রশ্রয়ে অবশ্য সাব-সেক্টরের কোন ছেলেই হিংসে বা মন-খারাপ করে না। কারণ অ্যাকশানের সময় মোহনের মতো ওইরকম জান বাজি রেখে শত্রুর পানে ধেয়ে যাবার বুকের পাটা অন্যদের একটু কমই আছে। আর মোহন এইরকম দুঃসাহসী, এত করিৎকর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুখে তার কোনো কথা নেই, কারো সঙ্গে বাদানুবাদ নেই, খাওয়া-শোওয়া নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই ... এ রকম ছেলেকে অপছন্দ বা হিংসে করবে কে?

পরদিন সকালে রফিক তার নির্দেশ পেল। বেলতলীর ক্যাম্প বন্ধ। পীরগঞ্জে হামিদ আলীর বাড়িতে আপাতত গোপন আস্তানা হোক। রফিকদের আরো কয়েকটা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল দেওয়া হল আর বলা যায় ওদের প্রত্যাশা মাফিকই প্রচুর গুলি। মোহন অনেকক্ষণ থেকে উশখুশ করছিল একটা কথা বলার জন্য। ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। ক্যাপ্টেন মাহবুব টের পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?' মোহন সাহস করে বলেই ফেলল, 'একটা স্টেন কিংবা এলএমজি সঙ্গে থাকলে—'

তার কথা শেষ হতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন মাহবুব বলে উঠলেন, 'অবকোর্স! একটা স্টেন কিংবা এলএমজি সঙ্গে থাকলে অনেক সহজে খানসেনা মারা যায়। সঙ্গে থাকা উচিতও। ওদেরকে মেরে একটা ছিনিয়ে নাও না?'

খুব সহজ গলাতেই বললেন ক্যাপ্টেন মাহবুব। কিন্তু শোনামাত্র মোহনের মুখ চোখ কান সব ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

মনে হল এক্ষুণি মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ, একে তো অ্যাকশান করতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এসেছে, তার ওপর কোন আক্কেলে মুখ ফুটে চাইতে গেল? সত্যিই তো, তাদের তো এইরকমই দাপট দেখানো উচিত। খানসেনা মেরেই এলএমজি ছিনিয়ে নিতে হবে।

এই সঙ্গে মনের কোণে একটা আফসোসও জেগে উঠল। তিসি নদীর লঞ্চ অ্যামবুশের দিনেই এলএমজিটা হাতে এসে যেত। শুধু যদি শিবেনটা নার্ভাস হয়ে গুলি করে না বসত।

সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা উঁচু করে বলল, 'অবকোর্স স্যার।'

অন্তিম সুর

মোহন চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিল। শান্টু পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। একটুও শব্দ হয়নি, তবু মোহনের চোখ খুলে গেল, ডান হাত আপনা আপনিই উঠে গেল সিথানে। সেখানে রাখা আছে চকচকে এক চাইনিজ স্টেনগান। শান্টু হেসে ফেলল, 'উরেব্বাপ্‌রে। হুঁশিয়ার বটে তুমি! তোমাকে অ্যামবুশ করে এমন বাপের ব্যাটা কেউ নেই।'

'নেই কে বলল? এই যে বাপের ব্যাটারা আমার পা দুটো অ্যামবুশ করে বসে আছে!' মোহনের পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বরে শান্টু খুব স্বস্তি অনুভব করল। একটু নিচু হয়ে মোহনের পায়ের পাতা দুটো দেখে বলল, 'নাহ্, অ্যামবুশ করতে পারেনি। সময় থাকতে তোমায় উঠিয়ে আনতে পেরেছি। আর ক'দিন দেরি হলেই সেপটিক হয়ে যেত। চাচার ওষুধ এক্কেবারে ধন্বন্তরী। ভালো না হয়ে যায়ই না।'

'তা হবে। হাজা আর কাটা ব্যাটা বাপ বাপ করে পালাতে দিশে পাচ্ছে না।' বলেই মোহন হি হি করে হেসে দিল।

স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে শান্টু অবাকও হচ্ছিল মনে মনে। গত তিন মাসে কোনদিন মোহন এতটা সহজ হাসিমুখে এই ধরনের হালকা কথাবার্তা বলেছে বলে তার মনে পড়ে না। সেটা কি মহিতলার

সফল অপারেশনের জন্য? নাকি সোলেমান মিয়ার বাড়িতে এমন আদর-যত্ন, ওষুধ-পথ্য সহকারে বিশ্রাম পাবার ফলে?

মহিতলার অপারেশনটা সত্যিই খুব বিপজ্জনক ছিল। একে তো পায়ের তলায় হাজা হয়ে কিছুদিন থেকে সবাই বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। ওদের প্রায় সবারই জুতো ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে জলে-কাদায় পায়ের অবস্থা সত্যি করুণ। আর এবছর বর্ষাটাও জাঁকিয়ে বসেছে বটে। এত বৃষ্টিতে খানসেনারা অবশ্য বেশ বিপাকে পড়েছে, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদেরও কষ্ট কম নয়। লতিফ বলেছিল, 'দুএকটা দিন পা শুকনো রাখতে না পারলে হাজা শুকোবে না। চল সবাই চাচার বাড়িতে ক'টা দিন থেকে আসি, চাচার কাছে খুব ভালো হাজার ওষুধ থাকে। পায়ের তলায় লাগিয়ে কয়েকটা দিন শুকনো রাখতে পারলেই একদম সেরে যাবে।' মোহন রাজি হয়নি। তখনো মহিতলার অপারেশনটা হয়নি। পাকসেনা মেরে একটা স্টেন কিংবা লাইট মেশিনগান ছিনিয়ে নেবার জন্য সে অধীর উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সেই উদ্দেশ্যে তার অপারেশানগুলিও ক্রমাগত বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। কমান্ডার রফিকের কাছ থেকে সে কথা আদায় করেছিল, অপারেশানে একটা স্টেন বা এলএমজি যদি সে ছিনিয়ে নিতে পারে, তবে সেটা তাকেই ব্যবহার করতে দিতে হবে। রফিক রাজি হয়েছিল। মহিতলার অপারেশানে একটা চাইনিজ স্টেনগান মোহনের হাতে এল বটে কিন্তু ঐসঙ্গে তার পাও কেটে গেল মজা পুকুরের পাঁকে কাঁচের টুকরো না শামুকের ভাঙা কানা ... কিসে যেন। তাও মোহন গা করেনি, পায়ের কাদা ধুয়ে একটা পুরনো কাপড়ের ফালি দিয়ে বেঁধে রেখে আরো অপারেশানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নতুন পাওয়া স্টেনগান দিয়ে শত্রুহননের উন্মাদনায় সে যেন মেতে গিয়েছিল। লতিফের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সোলেমান মিয়ার বাড়িতে যাবার নামও কানে তোলেনি। কিন্তু পা পেকে গিয়ে যখন প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল মোহন, তখন শান্টু নিজের হাতে নেতৃত্ব তুলে নিয়ে নির্দেশ দিল 'চলো রতনপুর।'

বেহুঁশ মোহনকে কাঁধে বহন করে লতিফ, রকিব, শান্টুরা সবাই রতনপুরে চলে এল সোলেমান মিয়ার বাড়িতে। সেও আজ চার পাঁচ দিন হয়ে গেল। এখন মোহন ভালোর দিকে।

শান্টু বলল, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছ ভাই। জোর বরাত আমাদের। তোমার কিছু হলে আমরা কোথায় যে ভেসে যেতাম।' বলতে শান্টুর গলা ধরে এল, চোখ ছলছল। শান্টুর মমতার এই প্রকাশে মোহন ভেতরে ভেতরে খুব বিহ্বল হয়ে পড়ে কিন্তু বাইরে সেটা বুঝতে দেয় না, কথা ঘুরিয়ে বলে 'তোমাদের পায়ে হাজা ... র কী অবস্থা? শুকিয়েছে?'

'হ্যাঁ শুকিয়েছে।'

'লতিফ, রকিব, শিবেন ... ওরা সব কোথায়? দেখি না যে?'

শান্টু হঠাৎ জবাব দিতে পারল না, মনে মনে বলল, ক'দিন যে আমরা সবাই তোমার ঘরেই থাকতাম সারাদিন সারারাত। তুমি তো দেখনি, জ্বরে বেহুঁশ ছিলে। আজ তোমাকে ভালো দেখে ওরা ক'দিনের ঘুম পুষিয়ে নিতে গেছে।

মোহন বলল, 'কি, চুপ করে আছ যে? জ্বরের ঘোরে তোমাদের সবার মুখ দেখতাম আমার চার পাশে, যেই একটু ভালো হয়েছি অমনি হাওয়া?'

শান্টু হো হো করে হেসে উঠল, 'সবই জানো দেখছি। তা হলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমাকে নিয়ে ক'দিন কারো ঘুম ছিল না। কাল থেকে তোমার বিপদ কেটে গেছে, কাল থেকে তারা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।'

আবার মোহনের মনটা দুলে উঠল, এবার সে মুখে সেটা প্রকাশ করল, 'সত্যি শান্টু, তোমরা যা করেছ আমার জন্য।'

শান্টু বাধা দিল 'ছি নান্টু, আমরা যে তোমার ভাই, দুঃখের দিনের দরদী—'

মোহন হেসে ফেলল, 'এইতো বেশ কবিতার ছন্দে কথা বেরিয়ে আসছে।'

শান্টু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল। মনে পড়ে গেল কয়েকমাস আগের কথা।

সে আগে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু আধটু গান লিখত।

বাড়ি থেকে আসার সময় তার দু'চারটে জামা-কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে গান লেখার খাতাটাও লুকিয়ে সঙ্গে নিয়েছিল। একদিন হঠাৎ মোহনের চোখে পড়ে যায় খাতাটা। ব্যাস্, শান্টুর লজ্জা দেখে কে! যেন সহযোদ্ধা কারো জিনিস চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল, সেইটে ধরা পড়ে গেছে। মোহন মুচ্‌কি হেসে বলেছিল 'আরে এত লজ্জা পাবার কী আছে? তুমি তো দেখছি উদীয়মান গীতিকার। এটা তো খুব ভালো কথা। ভেতরে কবিতা, গান, ছন্দ এসব থাকলে ভালো যুদ্ধ করা যায়।'

শান্টু তার স্বভাব সিদ্ধ হাঁ-ক্ করে শব্দ টেনে বলে উঠেছিল, 'এ আবার কি আজব কথা। যুদ্ধ আর গান হল গিয়ে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যুদ্ধ তো ধ্বংস করে দেয় গান, কবিতা ... এসব।'

'না, দেয় না। আমাদের এই যুদ্ধ তো মানুষ মারার বা দেশ ধ্বংস করার যুদ্ধ নয়। এ হল আমাদের বাঁচার যুদ্ধ। দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রেরণা দেয় কবিতা, উদ্বুদ্ধ করে গান। জানো, রাজশাহী থাকতে আমি স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলাম? আমিও ছড়া, গান এসব লিখতাম।'

শুনে সেদিন শান্টু খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠেছিল, 'ইস্! কত যে তোমার গুণ, একে একে বেরোচ্ছে। ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ন, ম্যাগাজিন-সম্পাদক, এখন আবার ছড়া-কবি। এদিকে এই কয় মাসে তো ক্র্যাকশুটার গেরিলা হয়ে গেছ।'

সেদিনের কথা মনে পড়ে শান্টুর মুখে একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে। লজ্জা কাটিয়ে বলে ওঠে, 'উদীয়মান গীতিকার যখন তখন তো কবিতার ছন্দে কথা বেরোবেই। দেখেছ তো এত ডামাডোলের মধ্যেও ফাঁক পেলেই আমি দু'চারটে গান লিখে ফেলি। তোমাকে কিন্তু এর মধ্যে একদিনও ছড়া বা গান লিখতে দেখিনি। কেন লেখ না?'

মোহন সিথানে হাত বাড়িয়ে স্টেনগানটা টেনে এনে বুকের ওপর রাখল। চকচকে যন্ত্রটার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু হেসে বলল, 'লিখি তো। তখন আমি এইটে দিয়ে গান লিখি। মৃত্যুর আখরে লিখি জীবনের গান।'

দরজার কাছে কার ছায়া পড়ল। হাতে একটা গেলাস ধরে ফুলী ঘরে ঢুকল। ধীর পায়ে মোহনের চৌকির পাশে এসে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে বলল, 'ভাইজান, দুধটুকু খেয়ে নিন।'

মোহন মেশিনগান পাশে রেখে উঠে বসল। তার তীব্র জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত কোমলতায় নরম হয়ে এল, হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে বলল, 'ক্যাম্পে থাকার সময় এই জিনিসটা খুব মিস্ করি। ছোটবেলা থেকে ... বুঝলে ... আমি হলাম গিয়ে দুধের ভক্ত।'

শান্টু নাক কুঁচকে বলল, 'উরেব্বাসরে। দুধ দেখলে আমার বমি আসে।'

ফুলী হেসে ফেলল, 'নান্টু ভাইজান দুধ খায় বলেই তো তার মাথা এখন সাফ। গায়েও কেমন জোর।'

শান্টু হাতের বাইসেপ ফুলিয়ে বলল, 'কেন, আমার গায়ে কি কম জোর? আসুক দেখি নান্টু আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে, এক প্যাঁচেই ফেলে দেব না!'

সবাই হেসে উঠল।

মোহন দুধ খাওয়া শেষ করে গেলাসটা ফুলীর হাতে ফিরিয়ে দিল। তারপর বিছানা ছেড়ে মেঝেয় নেমে দাঁড়াল। হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে শরীর টান করে ঘাড় লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল। শান্টুর মনে হল এই কয় মাসে মোহন যেন আরো লম্বা হয়েছে। গোঁফ-দাড়ি-জুলপির জন্য মুখের রোগাভাব টের পাওয়া যায় না। কে বলবে এই ছেলের বয়স ষোল পেরিয়ে মাত্র কয়মাস। গম্ভীর মুখে টেপা ঠোঁট আর জ্বলজলে চোখে তীব্র দৃষ্টি তাকে এমন এক ব্যক্তিত্ব দিয়েছে যে তার সামনে দাঁড়াতেই যেন বুক কেঁপে ওঠে।

ফুলীর ছোটবোন বকুল দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরে ঢুকে এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল, 'নান্টু ভাইজান শুনেছেন? শুনেছেন? কুসুমপুরে নাকি মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে?'

বকুলের বয়স দশ। চার বোনের মধ্যে সেই সবচেয়ে চঞ্চল। সারা পাড়া টোঁটো করে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির সবাই তাকে গেজেট বলে। সারা গ্রামের খবর তার নখদর্পণে।

মোহনের চোখের দৃষ্টি আবার তীব্র হয়ে উঠল। ক্ষণপূর্বে যে কোমল আভা তার মুখে খেলা করছিল, তা এখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। সে প্রায় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কার কাছে শুনলে?'

'কফিলদ্দি গরু চরাতে গেছিল উই নাকডুবির মাঠে। পাশের গ্রামের রাখালও গরু নিয়ে এসেছিল, তার মুখে শুনেছে।'

মোহনের হঠাৎ চোখ পড়ল ফুলীর দিকে। দেখল তার মুখ কেমন ভয়ার্ত, বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তার বয়স পনের। তার বোঝবার বয়স হয়েছে পাশের থানায় মিলিটারি ক্যাম্প করলে কী কী ভয়ের কারণ ঘটতে পারে।

সোলেমান মিয়া কোথায় যেন গিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে সোজা মোহনের ঘরে ঢুকে বললেন, 'বড় বিপদের আলামত দেখি যে নান্টু মিয়া। শুনে এলাম কুসুমপুরের কলেজ বিল্ডিংয়ে মিলিটারিরা ক্যাম্প বসিয়েছে।'

মোহন জিজ্ঞেস করল, 'কুসুমপুর কতদূর এখান থেকে? ক্যাম্প বসার খবরটা কি খাঁটি?'

'একেবারে খাঁটি খবর। কুসুমপুর এখান থেকে মাত্র চার মাইল। ওইখানে ঘাঁটি করল, কি যে মতলব ওদের, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একবার তো এ গ্রামের উত্তর পাড়ায় আগুন দিয়েছিল, সেই তিন চার মাস আগে। তখন মামাতো ভাইয়ের গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এখন তো সে গ্রামও পোড়া। সে বাড়ির সবাই ভেগেছে কোথায়। এখন এই চার-চারটে মেয়ে নিয়ে আবার কোথায় পালাব বল তো?'

মোহনের বুকের মধ্যে কি-যেন উথাল-পাথাল করে ওঠে, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটাও কথা বের হয় না। কেবল স্টেনগানটার ওপর তার ডানহাতের আঙুলগুলো চেপে বসে। সে শান্টুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'রাতে ভাত খাবার পর মিটিং।'

রাতে সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসেছে মোহনকে। কাজের সময়, বিপদের সময় মোহনের কণ্ঠস্বর আরো নেমে যায়। তাই ঠিকমতো শোনার জন্য সবাই ঘেঁষে বসে। সোলেমান মিয়া ছেলেদের পাশেই বসেছেন। রহিমা বিবি আর মেয়েরাও উপস্থিত আছে ঘরে। তবে তারা বসেছে একটু দূরে। মোহন বলল, 'শান্টু,

কাল সকালে তুমি আর রকিব দুজনে ডিম আর কলা বেচতে যাবে কুসুমপুরে ওদের ক্যাম্পে। সব দেখে বুঝে আসবে। চাচা কাল সকালের মধ্যে একঝুড়ি কলা আর ডিম জোগাড় করা যাবে?'

'কলা আমার বাগানেই তো এককাঁদি পাকনা ধরেছে। ডিম মনে হয় কম আছে, কিছু কিনে আনা শক্ত হবে না। তবে ওর সঙ্গে কয়েকটা মোরগ-মুরগি ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরো ভালো হবে।'

রহিমা বিবি বললেন, 'গোটা ছয়েক মোরগ-মুরগি বাড়ি থেকেই দেওয়া যাবে।'

বকুল লাফিয়ে উঠল, 'বাড়ির মুরগি দেবেন?' তার কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার প্রতিবাদ। বেলী বলে উঠল, 'বেঁচে থাকলে কতো মুরগি খাবি।'

বকুল কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আর ক'দিন পরেই দুটো মুরগি ডিম দেবে।'

মোহন বকুলকে কাছে ডাকল। সে এলে মোহন তার হাত ধরে পাশে বসিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'তুমি যাতে ভবিষ্যতে অনেক মুরগি পালতে পার, অনেক ডিম খেতে পার, তার জন্যই এখন তোমার মুরগিগুলো দরকার।'

বকুলের চোখ ছলছল করছে, মোহনের কথা সে না বুঝলেও ঘাড় কাত করে সায় দিল। সে অন্তত এটুকু বোঝে মোহন যে-সে লোক নয়, তাকে এতগুলো ছেলে মানে, তার বাপ-মা-বোনেরা মানে।

মিলিটারিরা খামোকা এদেশের লোকজন মেরে ঘড়বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সেই মিলিটারিদের জব্দ করার জন্য নান্টু ভাইজান আর এই ছেলেগুলো প্রাণপাত করছে। কিন্তু তার জন্য তার সখের মুরগিগুলো দিতে হবে কেন? তবে নান্টু ভাইজান যখন চেয়েছেন, তখন তো দিতেই হবে।

বকুলের চোখের কোণ থেকে টলটলে পানির ফোঁটা আঙুলের মৃদু টোকায় ঝরিয়ে মোহন বলল, 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। ওই খানসেনাগুলোকে কুসুমপুর থেকে হটাতে হবে, বুঝেছ? তা নাহলে আবার তারা এ গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে পারে। তিন-চার

মাস আগে একবার আগুন দিয়েছিল না? তোমাদের সবাইকে পালাতে হয়েছিল, তাই না? এবার হয়তো পালাবারও সুযোগ পাবে না, হয়তো মেরেই ফেলবে। আমার বাবা মা ভাই বোন পালাতে পারেনি, খানসেনারা বাড়িতে ঢুকে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে তাদের সবাইকে মেরে ফেলে। যাও, মায়ের কোলে গিয়ে বসো। কাল থেকে আর বাইরে যেয়ো না। কাউকে বলবে না এসব কথা। কেমন?'

বকুল ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে মায়ের কাছে চলে গেল। তার মা তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। মোহন সেদিকে তাকাতেই দেখল বেলী, ফুলী, হেনা কেমন ভয়ভয় মুখে তার দিকেই চেয়ে আছে। মোহন চোখ ফিরিয়ে নিল। ব্রাশফায়ারের তোড়ে তার বোনের গায়ে গুলি লেগেছিল বলেই সে মরে বেঁচে গিয়েছিল। এই মেয়েগুলোর গুলি খেয়ে মরে বাঁচবার সেই ভাগ্য নাও হতে পারে। সেকথা বোঝবার বয়স তিন বোনের হয়েছে। তাই ওদের মুখে ভয়ের ছায়া। মোহন মনে মনে বলল, 'বোনেরা, ভয় পেয়ো না। আমার জীবন দিয়ে হলেও তোমাদের ইজ্জত বাঁচাব।'

পরদিন সকালে শান্টু আর রকিব গরিব ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ করল। প্রথমে গায়েমুখে হাতে পায়ে কিছুটা ধুলো ঘসে ফের সেগুলো ঝেড়ে মুছে পুরনো ময়লা লুঙ্গি আর আধাছেঁড়া গেঞ্জি পরল। ঝুড়িতে ডিম, মুরগি, কলা নিয়ে চলল কুসুমপুরে খানসেনাদের ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে।

সোলেমান মিয়া বললেন, 'নান্টুমিয়া একটা কথা বলি। শুধু এই মিলিটারিদের মারলে কোন ফায়দা হবে না। পরদিনই কুমিল্লা থেকে আরো মিলিটারি এসে আশেপাশের গ্রাম জ্বালাবে, লোক মারবে। ওরা যে পথ দিয়ে আসে সেই পথে যে ব্রিজটা আছে, সেটা যদি ভেঙে দেওয়া যেত, তাহলে ওরা এদিক পানে আসতে পারতো না।'

মোহন, 'খুব ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন চাচা' বলে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল। কুমিল্লা থেকে কুসুমপুর আসার যে পথ, সেই পথের ধারেই একটু ভেতর দিকে পড়ে পীরগঞ্জ। ব্রিজটা যে জায়গায়, সেখান থেকে পীরগঞ্জ একমাইল মতো হবে। কমান্ডার রফিকের

পক্ষে ব্রিজটা ভাঙার পরিকল্পনা নেওয়া কঠিন কাজ হবে না। যদি একই রাতে কমান্ডার রফিকরা ভাটিখোলার ব্রিজ ওড়ায় আর মোহনরা কুসুমপুরের ক্যাম্প ওড়ায়, তা হলে আপাতত সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা যায়। সে রডারিক আর আবদুল্লাকে পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা এক্ষুণি পীরগঞ্জে রওনা হয়ে যাও। কমান্ডারের সাথে পরামর্শ করে, পারলে আজ রাতেই ফিরে আসবে।'

এখন বেলা প্রায় এগারোটা। সোলেমান মিয়া বললেন, 'চারটি ভাত পেটে দিয়ে যাও।' তাঁর বাড়িতে সারাদিনই ভাত-তরকারি মজুত থাকে। ভোরে উঠেই একদফা ভাত, ডাল, লাবড়া রান্না হয়। বাসার মুনিষরা তাই দিয়ে 'নাশতা' খেয়ে ক্ষেতে যায়। দুপুরের জন্য মাছ বা গোশতও রান্না শেষ হয়ে যায় বারোটার মধ্যে। আরেক ডেকচি গরম ভাতও নামে এই সময়ের মধ্যেই। রডারিক আর আবদুল্লা লাবড়া দিয়ে ভোরের রান্না ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ঝুড়ি আর কোদাল হাতে নিয়ে কামলার বেশে বেরিয়ে পড়ল পীরগঞ্জের পথে। এখান থেকে পীরগঞ্জ প্রায় পাঁচ মাইল। ওরা দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। কমান্ডার রফিক যদি আস্তানাতে থাকেন, তা হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করে আজ রাতেই ওরা ফিরতে পারবে। আর যদি তিনি অপারেশনে বেরিয়ে যান, তা হলে ওদের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ফেরত আসতে আসতে আগামীকাল হয়ে যাবে।

একটু ক্লান্ত লাগছিল। মোহন বিছানার ওপর কাত হল। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। সারা শরীর চনমন করছে। তার শরীর এখনো বেশ দুর্বল। কিন্তু বুকের ভেতরে যেন এক ক্ষ্যাপা ষাঁড় ঢুঁ মারছে। মনে হচ্ছে স্টেনগানটা নিয়ে এখনি ছুটে বেরিয়ে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর, ট্রা-রা-রা-রা করে ব্রাশ ফায়ারে মাটিতে লুটিয়ে দেয় ঐ রক্তখেকোদের শরীরগুলো—যেমন করে ওরা লুটিয়ে দিয়েছিল তার নিরপরাধ, সরলবিশ্বাসী, অসতর্ক বাবা-মা, ভাই-বোনদের শরীরগুলো।

মোহন খুব স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল কিন্তু সেটা বাইরে। তার মনে হতে লাগল, তার বুকের ভেতরে এমনই ধড়াশ ধড়াশ

শব্দ উঠছে যে তার চোটে তার শরীরটা জবাই করা মোরগের মতো তড়পাচ্ছে। ক্রমে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, যন্ত্রণায় মুখের রং বদলে ফ্যাকাসে হতে লাগল। যে মুহূর্তে মনে হল তার কণ্ঠনালী একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, এখনি দমটা হৃদপিণ্ডের ভেতরে ফুস্ করে নিভে যাবে, সেই মুহূর্তে সে 'মা গো' বলে বুকফাটা চিৎকার দিয়ে একঝটকায় বিছানার ওপর উঠে বসল। এমনই তীব্র সে চিৎকার, সারা বাড়ির আনাচ-কানাচ যেন কেঁপে উঠল সেই চিৎকারে। কিন্তু বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। সোলেমান মিয়া রডারিকদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন একটু এগিয়ে দেবার জন্য। রহিমা বিবি, ফুলী, হেনা, বকুলকে নিয়ে পেছনের সবজি ক্ষেতে গেছেন সবজি তুলতে। ছিল শুধু বেলী। 'কি হল, কি হল' বলতে বলতে ছুটে এল সে। দেখে বিছানার ওপর বসে মোহন থরথর করে কাঁপছে। তার দুই চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে রয়েছে। যেন সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বেলী ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কি হয়েছে নান্টু ভাই? শরীর খারাপ করছে? কোথাও ব্যথা?'

মোহন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল। মাথা নেড়ে বলল 'না, না, কিছুই হয়নি।'

'হয়নি তো অমন জোরে মাগো বলে চিৎকার দিয়ে উঠলে কেন? তুমি লুকোচ্ছ আমাকে। বল ভাই—'

বেলী দু পা এগিয়ে এল। মোহন আরো জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি কিছু হয়নি আপু। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্ন দেখে বোধ হয়—' সে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজল। বেলী খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। মোহনের দুই চোখ থেকে পানি পড়ে বালিশ ভিজতে লাগল, সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে মনে মনে বার বার করে বলতে লাগল, 'আপু, আপু গো ... আমার জান থাকতেও তোমাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ... মা, মাগো ... আমার জান থাকতে নয়, আমার জান থাকতে নয়—'

কুসুমপুর ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একতলা বিল্ডিংটা দেখতে লম্বা ব্যারাকের মতো। ঘরগুলো পর পর বসানো। সামনে খেলার মাঠ। দুপাশে দুটো গোলপোস্টও দেখা যায়।

একতলা কলেজের ছাদে বেশ কিছু রড বেরিয়ে আছে। কলেজটা দোতলা হবার প্ল্যান ছিল নিশ্চয়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বা অন্য যে কারণেই হোক, দোতলাটা আর হয়নি। পেছনে বেশ কিছু গাছগাছালি। বেশির ভাগই ফলের। শান্টু আর রকিব ঝুড়িতে সওদাপাতি নিয়ে খেলার মাঠের সামনে পর্যন্ত গিয়ে আর এগোল না। ওইখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদের মাথায় ঝুড়িতে মোরগ, কলা এসব নিশ্চয় খানসেনাদের চোখে পড়বে, তারা নিশ্চয় ওদের ডাকবে। কাজ কি বাবা আগেভাগে গিয়ে! যদি গুলি করে বসে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ওরা ওইখানেই মাথার ঝুড়ি নামিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বসল। আর লক্ষ্য করতে লাগল মিলিটারিগুলোর গতিবিধি।

বিল্ডিংয়ের বারান্দায় দাঁড়ানো, রাইফেল হাতে একজন খানসেনা হাত উঠিয়ে ওদের ডাকল। ওরা যেন খুবই ভয় পেয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল। ওদের এই ধীর গতিতে অধৈর্য হয়ে সৈনিকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠল; ওরা ভাষাটা বুঝল না, তবে মনে হল 'জলদি উঠে আয় বেটা' এই ধরনের কোন কথা হবে নিশ্চয়। ওরা তখন হুটোপুটি করে বারান্দায় উঠে সেন্ট্রিটার সামনে গিয়ে মেঝেতে ঝুঁড়ি রেখে প্রায় কুর্ণিশ করার মতো ঝুঁকে সালাম ঠুকল। লোকটা হেঁট হয়ে ঝুড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলল, ওরা ভাষা না বুঝলেও ঘন ঘন মাথা নেড়ে খুব সমঝদারের ভাব দেখিয়ে বলতে লাগল, 'নিয়ে যান হুজুর, খুব সস্তা, আপনাদের জন্যই এনেছি।' আর হাত দিয়ে ঝুড়িশুদ্ধ ভেতরে দিয়ে আসার ভঙ্গি করল। লোকটা কঠোর স্বরে কিছু বলে মাথা আর তর্জনী নাড়ল, তার মানে—'খবরদার এক পাও এগোবি না' বলে মনে হল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ্‌সে বসে পড়ল। সৈনিকটা পেছনে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকল, ঘরের ভেতর থেকে এক শ্যামবর্ণ বাঙালি-নন্দন বেরিয়ে এল। ওদের দেখে তার ভ্রু কুঁচকে গেল। 'তোরা কোন গ্রামের লোক?' তার এই প্রশ্নের জবাবে রকিব বলল, 'আমরা বহুদুর থেকে জিনিস ফেরি করতে এসেছি। উ-ই মল্লিকপুরের লোক আমরা। গাঁয়ের লোক কেনেন। তারা নিজেরাই ফলায় এসব। আপনারা যদি কেনে, তো চাল কিনে বাড়ি ফিরে যাই।'

'কতো দাম চাস্?'

'যা দেবেন দয়া করে। পেট ভরার মতো চাল কিনতে পারলেই বেঁচে যাই।'

'বোস্। দেখি লেফটেন্যান্ট সাহেবেরে বলে।' সে ভেতরে চ'লে গেল। শান্টু আর রকিব পরস্পরের দিকে একবার তাকায়। তাদের ঠোঁটের কোণে চোরা হাসি ফুটে ওঠে। লেফটেন্যান্ট সাহেব। তার মানে সেকেন্ড লেফটেনান্ট। তার অর্থ, তার অধীনে এক প্লাটুনের বেশি সৈন্য নেই এখন। এক প্লাটুন মানে তেত্রিশজন আর তার সঙ্গে এইরকম গোটাকতক বাঙালি রাজাকার।

খানিক পরে দুজন রাজাকার এসে ঝুঁড়ি দুটো তুলে নিয়ে গেল। তারপর কতো সময় যায়, কেউ আর আসে না দাম নিয়ে। ওরা এই অবসরে ঝুলঝুল নয়নে চেয়ে চেয়ে, সব দেখেশুনে নিচ্ছে। তারপর এক সময় মনে হল দাম নিয়ে কেউ আর আসবে না আজ। সেন্ট্রিটা রাইফেল হাতে লম্বা বারান্দার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে। শান্টু, রকিব তাকিয়ে দেখল পর পর মোট পাঁচটা ঘর। মাঝের দরজাটা ছাড়া দুপাশের দুটো দুটো চারটে দরজাই বন্ধ। জানালাগুলোও। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঘরটাকে ওরা খাবারঘর বানিয়েছে। টেবিলে কিছু বাটি, গেলাস, জগ দেখা যাচ্ছে। এক ছড়া কলাও রয়েছে। খানিকপরে শান্টু, রাকিব ভাবল আর দামের জন্য বসে থেকে লাভ নেই, ওদের যা দেখার দরকার ছিল, সব দেখে নিয়েছে। সেন্ট্রিটা হাঁটতে হাটতে ওদের কাছাকাছি আসতেই ওরা কপালে হাত টেকিয়ে বলল, 'সেলাম হুজুর, যাই।' লোকটা রাইফেলশুদ্ধ হাত নাড়িয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। অর্থাৎ কেটে পড়ো। ওরা মাথা নিচু করে, দুইহাত পেটের কাছে জড়ো করে, খুব ধীর পায়ে হেঁটে চলে এল। নাকডুবির মাঠের মাঝখানে দিয়ে হেঁটে রতনপুরে ঢুকে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা।

সব শুনে মোহন গম্ভীরভাবে শুধু বলল, 'হু'। এখন রডারিক আর আবদুল্লার জন্য অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষা করাটাই যেন মোহনের কাছে এখন সবচেয়ে শক্ত কাজ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে নিজেই উড়ে চলে যায় পীরগঞ্জে। মানুষ কেন পাখির মতো

উড়তে পারে না? কেন পারে না চিতাবাঘের মতো একরাতে শতেক মাইল পার হয়ে যেতে?

রডারিকরা এল পরদিন গভীর রাতে। যা ভাবা গিয়েছিল, কমান্ডার রফিক অপারেশনে গিয়েছিলেন, তাই তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কমান্ডার বলে পাঠিয়েছেন আগামী বুধবার রাতে ওঁরা ব্রিজ ওড়াবার অপারেশানে যাবেন। মোহনরাও যেন ঐ রাতেই কুসুমপুরের মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণ করে। তার আগে নয়। বুধবার আসতে এখনো তিনদিন বাকি। মোহন মুখে কিছু বলল না, কিন্তু তার ভেতরের অধৈর্য আর অস্থিরতা বোঝা গেল দ্রুত হাত ওলটানোর ভঙ্গিতে। শান্টু বলল, 'কি আর করবে! এই তিনদিন খেয়ে ঘুমিয়ে গায়ে বল করে নাও।'

'বল আমার গায়ে যথেষ্ট আছে। এই তিনদিনে কুসুমপুরের শয়তানগুলো কি-না-জানি করে।' রফিক বলল, 'ওরা প্রথম চোটে মাত্র এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে এসেছে, তাতে মনে হয় না এসেই গ্রাম পোড়ানো শুরু করবে। মনে হয় ওরা প্রথমে একদল এসে ঘর-গেরস্থালি গোছাচ্ছে। পরে আরো সৈন্য আসবে। মনে হচ্ছে লম্বা প্ল্যান।'

'সেইটাই তো ভয়। এখন ওখানে সৈন্য আর রাজাকার মিলে চল্লিশের বেশি হবে না। পরে আরো এসে গেলে মুশকিল হবে না?'

'হবে হয়তো, কিন্তু কমান্ডার নান্টু, এখন আমাদের তিনদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

মোহন খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উদ্ভাসিত মুখে বলল, 'এক কাজ করলে হয় না? চল আজই আমরা পীরগঞ্জে রওনা দিই।'

শুনে সবাই এতই অবাক হল যে তিনচারজনের গলা দিয়ে একসঙ্গে প্রশ্ন বেরোল, 'পী-র গঞ্জে? কি জন্য?'

মোহন বলল, 'আমরা ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে প্রথমে ব্রিজ ভাঙব, তারপর ওখান থেকে সোজা কুসুমপুরে চলে এসে খানসেনাদের আক্রমণ করব।'

সবাই চুপ করে প্রস্তাবটার যৌক্তিকতা ভাবতে থাকল। সোলেমান মিয়া বললেন, 'নান্টু বেটা, তুমি এখানে বসে থেকে

থেকে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ। ব্রিজ ভাঙার অ্যাকশনটা সফল না-ও তো হতে পারে? তখন কিন্তু দু' কুলই যাবে। তার চেয়ে কমান্ডার রফিকের প্ল্যান মতোই কাজ হোক। 'তিন দিন পরে, একই রাতে তোমরা কুসুমপুরে ক্যাম্প আক্রমণ করো, ওরা ব্রিজ ভাঙুক। ওরা অ্যাকশানে যদি বিফল হয়ও, তোমরা তো এখানে খানসেনাগুলোকে মেরে শেষ করতে পারবে।'

সোলেমান মিয়ার যুক্তি অকাট্য। মোহন মেনে নিল কিন্তু তার ভেতরের দাপাদাপিটা থামল না।

শান্টু, রফিক, শিবেন, রমাপদ—ওরা সবাই সোলেমান মিয়ার দহ্লিজ ঘরের চওড়া বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলের মুখেই রাগ আর হতাশার ছাপ। বেশ তো দুদিন ধরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। এখন আবার হঠাৎ বৃষ্টি থেমে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল কেন? আর তো ঘণ্টা দুই পরেই তারা অপারেশানে বেরোবে। এখন বৃষ্টি থামার কোন মানে হয়?

রমাপদ খুব গভীরভাবে আকাশ নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'নাহ্ মেঘেরা বেশিদূরে যায় নি। শুধু একটুখানি জিরিয়ে নিচ্ছে। চিন্তা করো না, এই বৃষ্টি একেবারে চলে যাবার বৃষ্টি নয়। আবার ঘুরে আসবে নে।'

আসাদ বলল, 'হুঃ তোকে বলেছে।'

'তুই জানিস না। পূর্ণিমা-অমাবস্যার সময় অন্তত বলা যায় বৃষ্টি চলবে। একাদশীর থেকে শুরু হয়েছে না? পূর্ণিমা না কাটান পর্যন্ত এ বৃষ্টি চলবে, তুই দেখে নিস্।'

ভেতরবাড়ি থেকে বকুল বেরিয়ে এসে ওদের ডাকল, 'ভাইজানরা, খেতে এসো, ভাত বাড়া হয়েছে।'

ওরা সবাই উঠে ভেতর বাড়িতে গেল। রোজকার মতো বারান্দায় পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা। রহিমা বিবি ছোট মোড়ায় বসে আছেন, বেলী, ফুলী, হেনা পরিবেশনের জন্য তৈরি। আজ বকুল বলল, 'আমি ভাইজানদের পাতে মাছ দেব।' বলে সে ভাজা মাছ ভর্তি গামলা উঠিয়ে সবার পাতে একটা করে মাছ দিয়ে যেতে লাগল। শান্টু হাসতে হাসতে বলল, 'ভাগ্যিস, তুমি

দিলে বকুল। তোমার পয়ে দেখবে আমরা আজ জিতে আসব।' ফুলী মৃদুস্বরে বলল, 'জিততেই হবে ভাই। নইলে আমরা কেউ বাঁচব না।'

মোহন উঁচু গলায় বলে উঠল, 'আমরা জিতবই। ওদের সবাইকে খতম না করা পর্যন্ত, আমরা ফিরছি না। আমাদের ভয়টা কি? বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ। দু'দিকেই আমাদের লাভ।'

বেলী হঠাৎ কেঁপে উঠল। তার স্বামী এখন কোথায় কোন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে, সে জানে না। সে জানে না তার স্বামী গাজী হয়ে ফিরে আসবে, না, শহীদ হয়ে সেই মাটিতেই শুয়ে থাকবে।

সে বিশেষ কারো দিকে না তাকিয়ে মোহনের কথার জবাব দিল, 'সাহস থাকা ভালো। তবে সাবধান থাকাও দরকার। কথায় বলে সাবধানের মার নেই।'

মোহন হো হো করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ আপু আবার মারেরও সাবধান নেই।' বাকি সবাই-ও তার হাসিতে যোগ দিল।

রাত দশটার দিকে চাঁদ আবার মেঘে ঢেকে গেল। ভিজে ভিজে হাওয়া দিতে লাগল। আশা হচ্ছে শিগগিরই আবার বৃষ্টি নামবে। শান্টু সুর করে বলতে লাগল, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।'

রমাপদ বলল, 'যা চাও, সব দেব। পুকুরের মাছ, গাইয়ের দুধ, সব দেব, না মেপেই দেব, তবু তুমি এসো।'

মোহন বলল, 'এবার তা হলে রওনা দিই।'

সবাই একে একে সোলেমান মিয়া ও রহিমা বিবিকে সালাম করল। সোলেমান মিয়া ওদের মাথায় হাত রেখে অস্ফুটে দোয়া পড়লেন, রহিমা বিবি দোয়া পড়ে প্রত্যেকের মাথায় ফুঁ দিলেন। চারটি বোন নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ছেলেরা সবাই চোখ তুলে তাকাল কিন্তু কারো মুখে কোন কথা ফুটল না। সবাই বোধ করি মনে মনে বলল, 'যাই গো বোনেরা। জানি না আবার দেখা হবে কিনা।

এখনো বৃষ্টি আসেনি, কিন্তু চাঁদ মেঘে ঢাকা। ওরা কলেজ বিল্ডিং থেকে যখন প্রায় সিকি মাইল দূরে, তখন হঠাৎ মেঘ সরে চাঁদের আলো ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঝাঁকড়া এক

আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে কলেজের দিকে তাকাতেই সবার চোখে পড়ল একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিংয়ের সামনে। শান্টু বলে উঠল, 'ট্রাক! ট্রাক কখন এল? দুপুরে যখন ওয়াচ করে গেছি, তখনো তো ছিল না!'

মোহন বলল, 'তারপর নিশ্চয় এসেছে। ইস্, বিকেলে কেন যে কাউকে ওয়াচে পাঠাইনি।'

নিজের ওপর রাগে তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। এই কয়দিন রোজই দুবেলা দুজন করে এসে দেখেশুনে গেছে। কেবল আজই বিকেল বেলাটা কাউকে পাঠায়নি। কেন সে বিকেলে কাউকে পাঠায়নি ওয়াচ করার জন্য? তার কি আত্মবিশ্বাস বেশি হয়ে গিয়েছিল?

রডারিক বলল, 'ট্রাকটায় কতজন সৈন্য এসেছে কে জানে!'

শিবেন বলল, 'ধরে নিতে হবে ট্রাক ভর্তি হয়েই এসেছে। কতো জন এক ট্রাকে ধরতে পারে, হিসেব করে দেখ।'

মোহন বলল, 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমাদের সঙ্গে একটা স্টেন, আটটা থ্রি-নথ-থ্রি আর প্রচুর গুলি আছে। গ্রেনেডও আছে যথেষ্ট। আমরা সংখ্যায় বারো জন। ওরা যদি পুরো বিল্ডিংটা বোঝাই হয়েও থাকে, তবু আমরা ওদের শেষ করতে পারব। আমরা যখন আক্রমণ করব তখন তো ওরা ঘুমিয়ে থাকবে। ঘুম ভেঙে কি হল, বোঝবার আগেই ওরা গুলি খেয়ে ঢলে পড়বে।'

চাঁদ আবার মেঘে ঢেকে গেল। গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। শান্টু গুন গুন করে বলতে লাগল, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।'

কলেজের সামনের টানা বারান্দায় একজন সেন্ট্রি ডিউটি দিচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে মোহন বলল, 'ঘুরে যেতে হবে। কলেজের পেছন দিকে যেতে হবে। ওদিকে বেশ কয়েকটা বড় বাড় গাছ আছে। ওদিক থেকেই আক্রমণ করতে সুবিধে হবে আমাদের।'

ফিন্ ফিন্ করে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। ওরা কলেজের পেছনে ফলের বাগানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি বেশ জোরেই এল। একতলা কলেজ বিল্ডিংয়ের পেছন দিকেও লম্বা বারান্দা।

সেখানেও একটা সেন্ট্রি ডিউটি দিচ্ছিল, সে এবার বারান্দার এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা চৌকিতে শুয়ে পড়ল। শান্টু মনে মনে বলল, 'বাঃ তুমি তো বেশ ছেলে ভাই! বৃষ্টি দেখে ডিউটি ফেলে শুয়ে পড়লে? ধরা পড়লে তোমার কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে যে! তবে তার আর দরকার হবে না, তার আগেই আমরা তোমায় খতম-মার্শাল করে দেব। তুমি শুয়ে পড়ে আমাদের সুবিধেই করে দিলে।'

মোহন একটা চাপা হিস্ হিস্ শব্দ করল, অমনি সবাই দ্রুত তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল, তাদের কানগুলো মোহনের মুখের কাছে নিয়ে এল। মোহন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'শিবেন, সুলতান, আসাদ, রডারিক আর মমিন, তোমরা পাঁচজনে প্রথমে গ্রেনেড চার্জ করবে। একেক জনে তিনটে করে। তোমাদের লক্ষ্য পাঁচটা দরজা আর জানালাগুলো। তার পেছনে রকিব, লতিফ, হাসান, আবদুল্লা, রমাপদ, তোমরা রাইফেল হাতে। ওরা গ্রেনেড চার্জ করে মাটিতে শুয়ে পড়া মাত্র তোমরা গুলি করতে করতে এগিয়ে যাবে। আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্টেন চালাব। শান্টু আমাদেরকে কভার দেবে পেছনে থেকে।'

শান্টু গুজগুজিয়ে উঠল, 'আমি গ্রেনেডে থাকতে চাই।'

মোহন কড়াস্বরে বলল, 'কমান্ডারের হুকুম দেয়া হয়ে গেছে। সবাই ঠিকমতো মনে রাখবে। মাথা ঠা-ণ্ডা। আর শুনে রাখ—ওরা একটাও জীবিত থাকতে আমরা পেছন ফিরব না। রাইট? আর এই অপারেশন সাকসেস্‌ফুল হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পীরগঞ্জের পথে ডবল মার্চ ...'

সবাই খুশিতে অস্ফুট শিস্ দিয়ে উঠল। মোহন বলল, 'রেডি—'

ওরা সবাই শরীর টানটান করে দাঁড়াল। সামনের বিল্ডিংটা একদম

নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে কাদা ... বোঝাই যাচ্ছে। মোহন হিসহিসিয়ে বলল, 'চা-র্জ।'

মুহূর্ত পরে বুম্‌ম্ বুম্‌ম্ শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। ফটাফট দরজা জানালা ভেঙে পাল্লা কোথায় উড়ে যেতে লাগল। তারপর

পরই শোনা গেল থ্রি-নট-থ্রির ধু-ম্-ম্ ধু-ম্-ম্ শব্দ, স্টেনগানের ট্রা-রা-রা-রা শব্দ। খানসেনাদের মধ্যে বেশিরভাগই ঘুম থেকে জেগে ওঠারও অবকাশ পেল না। বাকিরা উঠে অস্ত্র হাতড়াতে হাতড়াতে কাটা কলাগাছের মতো ধপাধপ মেঝেতে পড়ে যেতে লাগল। দু-চারজন কয়েকটা গুলি করতে পারলেও, সে মাত্র দু-চার মিনিটের জন্য। তারপর তারাও ধপাধপ পড়ে গেল।

মোহনরা সবাই গুলি করতে করতে বারান্দায় উঠে ঘরে ঘরে ঢুকে যেতে লাগল, কোন প্রতিরোধ নেই। আহ্, কি আরামের যুদ্ধ। এরকমটি যদি সব অপারেশানগুলো হ'ত। উঃ আজ ক'টা না জানি স্টেন, মেশিনগান, কত না জানি গুলি তারা পেয়ে যাবে!

আরো বেশ কয়েক মিনিট গুলি চালিয়ে গেল ওরা। ওপক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। মোহন বলল, 'টর্চ আর বেয়নেট নিয়ে ঘরে ঘরে ঢোক। জখমী যে কয়টা বেঁচে আছে, খুঁচিয়ে শেষ করে দাও।' সে নিজেও টর্চ হাতে একটা ঘরে ঢুকল। আর তখনই ঘটল সেই মহা সর্বনাশ। মোহন ঘরের ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই কোণা থেকে একটা গুলি ছুটে এসে বিদ্ধ করল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আঁ-ক্ করে কেমন একটা শব্দ বেরোল মোহনের মুখ থেকে। ঠিক চিৎকারও নয়। কিন্তু সে ধপাস করে পড়ে গেল। তার পেছনেই ছিল শান্টু। সে সঙ্গে সঙ্গে তার রাইফেল তাক করে মেরে ফেলল মেঝেয় পড়ে থাকা আহত পাকসেনাটিকে। তার পরেই সে হাহাকার করে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'নান্টু, নান্টু, একি সর্বনাশ হল।'

তার চিৎকারে সবাই ছুটে এল। শান্টু ততক্ষণে মেঝের বসে পড়ে মোহনের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে। সবাই হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে চারপাশে ঘিরে ঝুঁকে পড়ল। মোহনের বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছে, অজস্র ধারে রক্ত পড়ছে, তার রক্তে শান্টুরও জামা ভিজে গেছে।

জীবনীশক্তি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এর মধ্যেই চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে সবার মুখের দিকে তাকাল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'ফিরে এসে কবর দেবে। এক্ষুণি পীরগঞ্জের পথে রওনা হয়ে যাও। ডবল মার্চ। কমান্ডারের আদেশ।'

তারপরেই তার মাথাটা একপাশে ঢলে পড়ল।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ কে হিসেব রাখে, মনে হয় অনন্তক্ষণ ধরে শান্টু মোহনের মাথা বুকে জড়িয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল; অন্য সবাই তার চারপাশে মাটিতে বসে, লুটিয়ে ছিল। আকস্মিক সর্বনাশের ধাক্কায় সবাই যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। তারপর একসময় শান্টু ঘাড় সোজা করে মুখ তুলল। খুব ধীরে মোহনের মাথা কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখল ... মা যেমন ঘুমন্ত ছেলেকে সাবধানে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় রাখে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল। ভাঙা, ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'সবাই ওঠো। কমান্ডারের শেষ হুকুম। এখুনি পীরগঞ্জের পথে রওনা দিতে হবে। তার আগে দুশমনদের স্টেন, মেশিনগান যতগুলো পাও, নিয়ে নাও। আর গুলি। ওগুলো সঙ্গে থাকলে ভাটিখোলার ব্রিজ ওড়ানো তো বেলুন ফাটানো। রফিক ভাই দেখে যা খুশি হবে না। ফিরে এসে সবাই মিলে সাতগ্রামের সব লোক জড়ো করে আমাদের কমান্ডারকে বীরের মর্যাদায় দাফন করব। কমান্ডার, তুমি এখন থাকো এইখানে। আমরা চললাম।' বলে ডুকরে কেঁদে উঠে শান্টু স্কুলঘরের ভেতরে ছুটল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আর গুলি হাতে তুলে নেবার জন্য।

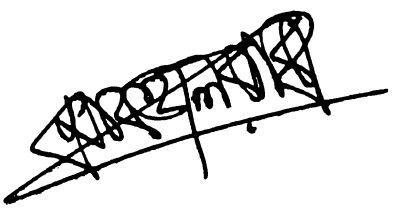

নিজে বই কিনুন।

অন্যকে বই উপহার দিন।

২২/৩/২০ইং